জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র

বুলেটিন নং ৩৬ • ১৬ বর্ষ • ৯ আগষ্ট ২০০৬ • আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস সংখ্যা

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ঃ কেমন আছে এদেশের আদিবাসীরা?
জুম্ম জনগোষ্ঠী কি উপজাতি, আদিবাসী নাকি বহিরাগত?

'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করুন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে জনসংহতি সমিতির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা

জুম্ম নারীদের উপর যৌন ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের প্রকাশিত পুস্তিকা ও সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ড বন্ধ করা হোক

জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

বুলেটিন নং ৩৬ ◆ বর্ষ ১৬

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস সংখ্যা

প্রকাশকাল:

৯ আগস্ট ২০০৬

প্রকাশনায়:

তথ্য ও প্রচার বিভাগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

যোগাযোগ:

তথ্য ও প্রচার বিভাগ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

টেলিফোন ও ফ্যাক্স: +৮৮০-৩৫১-৬১২৪৮

ই-মেইল: pcjss@hotmail.com

pcjss@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০.০০ টাকা মাত্র

JUMMA SAMBAD BULETIN

Buletine No 36 ◆Year 16

International Indgenous Peoples Day Issue

Published on:

9 August 2006

Published by:

Department of Information and Publicity

Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti

Contact:

Department of Information and Publicity

Central Office

Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti

Kalyanpur, Rangamati

Chittagong Hill Tracts, Bangladesh

Tel & Fax: +880-351-61248

E-mail: pcjss@hotmail.com

pcjss@gmail.com

Website: www. pcjss.org

Price: Tk. 30.00 only.

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘ ঘোষিত ৯ আগষ্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস বিশ্বের দেশে দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা পালন করছে। বাংলাদেশের ২৫ লক্ষাধিক আদিবাসী মানুষ এ দিনটিকে পালন করছে তাদের অস্তিত্বকে তুলে ধরার প্রয়াসে। মানব সভ্যতার বিকাশে পুঁজিবাদী দেশসমূহ যখন সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করে বিশ্বকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে ভাগবাটোয়ারা করে নেয় তখন বিজিত তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনগ্রসর জাতিসমূহ নিজ নিজ দেশে দেশহীন হয়ে পড়ে। পরে বড় বড় জাতিসমূহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে জাতীয়তাবাদের ধুয়োয় উপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করলেও এসকল স্বাধীন দেশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসীরা হয়ে পড়েন উগ্র জাতীয়তাবাদের বর্বরতার শিকার। উপনিবেশিকতার পাশাপাশি উগ্র জাতীয়তাবাদী শাসন-শোষণ তাদের অস্তিত্বকে হুমকীর মুখোমুখি করে তোলে। এই নব্য উপনিবেশিকতাবাদ দেশহীন, অধিকারহীন জনগোষ্ঠীগুলোর জীবনধারাকে বিপর্যস্থ করে ফেলে। তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার প্রতিনিয়ত ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এহেন বাস্তবতায় আদিবাসী মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘ আদিবাসীদের অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠার তাগিদ হতে বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালকে ঘোষণা করে আদিবাসী বর্ষ হিসেবে এবং ৯ আগষ্টকে পালন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস হিসেবে। তার পাশাপাশি ১৯৯৫ হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত পালন করা হয় আদিবাসী দশক। জাতিসংঘে গড়ে তোলা হয় আদিবাসীদের জন্য স্থায়ী ফোরাম। বাংলাদেশের আদিবাসীরা এই মহান উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে নিজেদের অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠার ব্রতে এই দিবসটির তাৎপর্যকে ধারণ করে চলেছে। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীসমূহ উগ্র জাত্যাভিমানী ও সাম্প্রদায়িক হওয়ায় কখনো রাষ্ট্রীয় জীবনে আদিবাসীদের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়নি। ফলে সংবিধানে আদিবাসীরা আজও অস্বীকৃত। জাতীয় উন্নয়নের স্রোতধারায় তাদের অংশগ্রহণ উপেক্ষিত। আদিবাসীরা নিজ ভূমি হতে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হচ্ছে। উন্নয়নের নামে, বনায়নের নামে, বিভিন্ন প্রকল্পের নামে তাদের ভূমি কেড়ে নেয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আদিবাসী নারীরা লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন, জাতিগতভাবে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘন করে শাসকগোষ্ঠী আদিবাসীদেরকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম আদিবাসীদের জাতীয় জীবন এখনো নিরাপদ নয়। তিন পার্বত্য জেলায় সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করে ভূমি বেদখল করা হচ্ছে। ভূমি বেদখল করার সময় সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হচ্ছে। এসকল হামলায় প্রত্যক্ষভাবে স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ মদদ দিচ্ছে। বনবিভাগ বনায়নের নামে আদিবাসীদের ভূমি কেড়ে নিচ্ছে। স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ এসকল অপকর্মে 'অপারেশন উত্তরণ' এর বদৌলতে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। ১৯৯৭ সালে আদিবাসীদের সাথে সরকারের স্বাক্ষরিত চুক্তিকে বাস্তবায়নে শাসকগোষ্ঠী আন্তরিক নয়, উদ্যোগী নয়; বরং এই চুক্তিকে পদদলিত করার প্রয়াসী। শাসকগোষ্ঠী আদিবাসী জুম্মদের উপর উপনিবেশিক 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতি প্রয়োগ করে চলেছে এবং এই চুক্তিকে বাস্তবায়ন না করে চুক্তিকে বিরোধীতা করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল সৃষ্টি করছে। এই চুক্তিকে নস্যাৎ করার জন্য আদিবাসীদের মধ্য হতে 'ইউপিডিএফ' নামধারী একটি সন্ত্রাসী চক্রকে মদদ দিচ্ছে এবং বাঙালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী ছড়িয়ে চুক্তিকে বিরোধীতা করার জন্য 'বাঙালী সমঅধিকার আন্দোলন' নামক একটি সাম্প্রদায়িক ভূঁইফোড় সংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। ইউপিডিএফ চক্রটি আদিবাসীদের উপর চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় এবং হত্যাকান্ড চালাচ্ছে। স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষের একটি বিশেষ অংশ প্রত্যক্ষভাবে তাদের সমর্থন যোগাচ্ছে। অন্যদিকে সমঅধিকার আন্দোলন প্রশাসনের ও চার দলীয় জোট সরকারের সাম্প্রদায়িক মহলের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় ভূমি বেদখল, সাম্প্রদায়িক উস্কানী ও হামলা করে চলেছে। তারা একদিকে চুক্তি বাতিলের দাবী জানাচ্ছে অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য প্রশাসনের স্বার্থান্বেষী মহলের যোগসাজশে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। এমনকি চুক্তির আলোকে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে যথাযথভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পদ নিজের হাতে রাখায় মন্ত্রীসভায় আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বকে খর্ব করা হয়েছে। সরকার আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমূহের কার্যপ্রণালী বিধি অনুমোদন না দিয়ে পরিষদসমূহকে যথাযথ দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

আশার কথা যে, শত প্রতিকুলতা ও ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে আদিবাসী জুম্মদের সংগ্রাম এগিয়ে চলছে। গ্রামে গ্রামে আদিবাসীরা সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলেছে। ছাত্র-যুব সমাজ সংগঠিত হচ্ছেন। সমতল আর পাহাড়ের আদিবাসীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে লৌহ দৃঢ় 'আদিবাসী ঐক্য'। দেশের ব্যাপক জনসাধারণ আদিবাসীদের অধিকারের পক্ষে সরব হচ্ছেন। বুদ্ধিজীবীমহল তথা সুশীল সমাজ ও প্রগতিশীল শক্তি আদিবাসীদের অধিকারের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছেন। আমরা আশা করি আদিবাসী জাতিসমূহের স্বীকৃতি ও তাদের যথাযথ অধিকার প্রদান করে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এগিয়ে আসবেন। ◆

সূচীপত্র

প্রবন্ধ		*পৃষ্ঠা*
আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ঃ কেমন আছে এদেশের আদিবাসীরা?	▸ লক্ষী প্রসাদ চাকমা	৪
জুম্ম জনগোষ্ঠী কি উপজাতি, আদিবাসী নাকি বহিরাগত?	▸ মঙ্গল কুমার চাকমা	৭
প্রসঙ্গ ঃ 'অরক্ষিত হয়ে পড়ছে তিন পার্বত্য জেলার সীমান্ত'	▸ গৌতম কুমার চাকমা	১৪
জুম্মদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির নীল নক্সা	▸ ধীর কুমার চাকমা	১৬
পার্বত্য চট্টগ্রামে 'আদিবাসী' প্রশ্নে	▸ তনয় দেওয়ান	১৯
মানবিকতার ছেঁড়া স্বপ্নের জামা: সমকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসংগ	▸ হেমন্ত ত্রিপুরা	২২

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অষ্টম বর্ষপুর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র	২৪
মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা	৩৩
THE PROTEST LETTERS ON MAISCHARI COMMUNAL ATTACK WRITTEN BY HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS AND ACTIVISTS ARE GIVEN BELOW	৩৮

'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করুন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে জনসংহতি সমিতির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত	৪৫
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জবরদখল অব্যাহতভাবে চলছে	৪৮
খাগড়াছড়ি জেলার গামারীঢালাতে সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ	৫১
জুম্ম নারীদের উপর যৌন ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে	৫৩
জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ৫ম অধিবেশন ও বাংলাদেশ সরকারী প্রতিনিধির হাস্যকর বক্তব্য	৫৬
খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের প্রকাশিত পুস্তিকা ও সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ড বন্ধ করা হোক	৫৮

সংবাদ প্রবাহ	৬০

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ঃ কেমন আছে এদেশের আদিবাসীরা?

লক্ষী প্রসাদ চাকমা

৯ আগষ্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। সারা বিশ্বের ৭০টি দেশের ৩৭ কোটি আদিবাসী মানুষ এই দিবসটি সুদিনের প্রত্যাশা নিয়ে উদযাপন করবে। বাংলাদেশের সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ২৫ লক্ষ মানুষ নিজেদের উদ্যোগে এ দিবসটি উদযাপন করতে যাচ্ছে। উদযাপনের পূর্ব মূহূর্তে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে এদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা কেমন আছে? সত্যি কথা বলতে গেলে সোজাসুজি বলা যায় যে, বাংলাদেশের আদিবাসীরা ভাল নেই।

আমরা সকলেই জানি ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করার সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী উত্থাপন করেছিলেন। জাতীয় সংসদে জোরালো কণ্ঠে এ দাবীর সমর্থণে বক্তব্য রাখেন। তৎকালীন শাসকশ্রেণী এ দাবী পূরণে মোটেও উদার, মহৎ ও দুরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি। উগ্র ধর্মান্ধ ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের ধারক-বাহক উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী নব্য শাসকশ্রেণীর অবহেলা, অবজ্ঞা ও ষড়যন্ত্রের কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলের আদিবাসীরা সাংবিধানিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত। সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকার কারণে আদিবাসীরা যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার আবহমান কাল থেকে ভোগ করে আসছে সেগুলোও শাসক-শোষকশ্রেণী আগ্রাসনের সুবিধার্থে খর্ব করে দিতে থাকে। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত অধিকারগুলোর টুঁটি চেপে ধরে হত্যা করা হয়।

এক জাতি এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে শাসক-শোষকশ্রেণী তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে মোটেও রাজি নয়। কারণ সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিলে আদিবাসীদের নাম দিতে হয়; নাম দিলে পরিচয় দিতে হয়; সেই সাথে রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, আইনগত অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, ভূমি অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার দিতে হয়। বিপরীতে দেখা গেছে, স্মরণাতীত কাল থেকে সে সকল ঐতিহ্যগত অধিকার ভোগ করে আসছে; মোঘল ও ইংরেজ শাসনামলে যে অধিকার ভোগ করেছে, সে অধিকারগুলো একটির পর একটি কেড়ে নেয়া হচ্ছে। সুতরাং সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছাড়া আদিবাসীদের কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত হতে পারে না। এ জন্য সাংবিধানিক স্বীকৃতি অর্জন করতে হবে।

প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি, সেই সাথে তিনি সংবিধানের আওতায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পাওয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করেছিলেন। এ দাবী অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত দাবী, যা আজ জাতিসংঘ তথা আন্তর্জাতিক আইন কর্তৃক স্বীকৃত।

আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি অর্জন খুবই জরুরী। ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সাথে আধআধিভাবে জড়িয়ে আছে। অতীত থেকে আদিবাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, উত্তর-পূর্ব বঙ্গ (রাজশাহী) বিভাগ, কক্সবাজারের টেকনাফ, বরিশাল, পটুয়াখালিতে বসবাস করে আসছিল। এই ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার আদিবাসীরা আজ সব জায়গায় হারাতে বসেছে। বর্তমানে শাসকশ্রেণী এই ঐতিহ্যগত ভূমির কথা নাকচ করে দিয়ে খাস ভূমি বলতে চাচ্ছে। আমরা আদিবাসী বলে এই অধিকারের দাবীদার হিসেবে দাবী করছি না। এই ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার ভারতবর্ষে যতগুলো ছোট বড় জনগোষ্ঠী রয়েছে, সে সকল জনগোষ্ঠীগুলো এই অধিকার ভোগ করেছিলো।

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, এদেশে ইংরেজ উপনিবেশিক শাসন-শোষণ প্রতিষ্ঠার আগে মোঘল শাসনের আগে ও পরে ছোট বড় সকল জনগোষ্ঠীর মানুষ এই ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার ভোগ করেছিলো। তখনকার ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার ভিত্তি ছিলো 'গ্রাম সমাজ'। এই ব্যবস্থাধীনে গ্রাম সমাজের প্রতিটি সদস্য, প্রতিটি পরিবার বংশানুক্রমে চাষাবাদে অংশগ্রহণ করেছিলো। কিন্তু ভূমির উপর কারোর ব্যক্তিগত অধিকার ছিলো না। এই ভূমির অধিকার ছিল যৌথভাবে গ্রাম সমাজের। রাজা-বাদশারা রাজ্যের মালিক এই দাবীতে ভূমি চাষাবাদের উপর রাজস্ব আদায় করতো। রাজা-বাদশাদের প্রতিনিধি রাজস্ব আদায়কারী জমিদারের উপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত ছিলো। এই রাজস্ব সমগ্র গ্রাম সমাজের উপর নির্ধারণ করা হতো। গ্রাম সমাজের পরিবারগুলোর ঘরে ঘরে সুদিনমাসে ফসল উঠে আসলে, রাজস্ব আদায়কারী জমিদার নির্দিষ্ট দিনে গ্রামে উপস্থিত হয়ে রাজস্ব আদায় করতো এবং ফসলের মাধ্যমে এই রাজস্ব দেয়া হতো। এই জমিদার আদায়কৃত সমগ্র রাজস্বের (ফসলের) দশভাগের একভাগ সম্মানী বা পারিশ্রমিক নিয়ে অবশিষ্ট নয় ভাগ রাজভান্ডারে জমা দিতো।

সে সময় ভূমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিলো না বলে ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য হিসেবে গণ্য হতো না। কিন্তু এদেশের শাসন ক্ষমতা ইংরেজের দ্বারা কেড়ে নেয়ার পরে এদেশের মানুষের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারও কেড়ে নেয়। শোষণের স্বার্থে ইংরেজ শাসকরা ব্যবসা করতো এবং রাজস্ব আদায় করতো। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা ও বিহারের

দেওয়ানী লাভ করলে 'গ্রাম সমাজ' এর ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার কেড়ে নেয় এবং রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটায়। রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা সুসংহত করার জন্য প্রত্যেক জেলায় রেভিনিউ বোর্ড গঠন করা হয় এবং বোর্ডগুলোকে একটি কেন্দ্রীয় রেভিনিউ বোর্ডের অধীনে আনা হয়। সেই সাথে শোষণের মাত্রা বাড়ানোর জন্য রাজস্ব বাড়ানো হয়। এই বর্ধিত রাজস্ব দিতে অসমর্থ হলে কৃষকের কাছ থেকে বংশানুক্রমে ভোগদখলীয় ভূমি (জমি) বিক্রি করে দিয়ে এই রাজস্ব আদায় হতো। এভাবে ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ভূমি (জমি) ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত হয় এবং ফসলের পরিবর্তে টাকায় রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি প্রচলন হয়। ভূমি রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে ভূমি সংক্রান্ত এক নতুন অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই ভূমি অর্থনীতি ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে কার্যকরী করা সম্ভব হয়। তাই ইংরেজ শাসকরা ভারতবর্ষে তাদের শাসনের ভিত্তি দৃঢ় ও সংরক্ষিত করার জন্য গ্রাম সমাজভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে ইউরোপীয় ভূস্বামীগোষ্ঠীর আদলে ভারতীয়দের মধ্য থেকে নতুন ভূস্বামীশ্রেণী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৭৯৩ সালে ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার পত্তন করে এবং তার সাথে সাথে ভারতীয় গ্রাম সমাজে মানুষ ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার হারায়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থা চালু হলেও ইংরেজ শাসনামলে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার খর্ব বা কেড়ে নেয়া হয়নি। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান স্বাধীনতা অর্জন করা পর্যন্ত, এমনকি পাকিস্তান শাসনামলের শেষভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশে আদিবাসীরা নির্বিঘ্নে এই ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার ভোগ করে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দু'শ বছর ইংরেজ উপনিবেশিক শাসনামলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীগুলো বিদ্রোহ, আন্দোলন-সংগ্রামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা কোন কোন সময় একসাথে অংশগ্রহণ করেছিলো আবার এককভাবেও ইংরেজ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-লড়াই-সংগ্রাম করেছিলো। আদিবাসীদের কোন কোন বিদ্রোহ এমন ভয়ংকর রূপ ধারণ করে যে, ইংরেজ শাসনের জন্য অন্যান্য বিদ্রোহীগুলোর চেয়ে বেশী হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সান্তাল (সাঁওতাল) বিদ্রোহের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ইংরেজ শাসকরা এই কথা মাথায় রেখে আদিবাসীদের বিদ্রোহ ঠেকাতে বড় জনগোষ্ঠীগুলোর সাথে আদিবাসীদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে বিশেষ শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, স্থানীয় শাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা অনুসারে এই 'বিশেষ শাসনব্যবস্থা' গ্রহণ করে। শাসন বহির্ভূত এলাকা, উপজাতি-আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা, তফসিলীভূক্ত জেলা ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দিয়ে আদিবাসীদের জন্য পৃথক 'বিশেষ শাসনব্যবস্থা' চালু করা হয়। এজন্যে পৃথকভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বিশেষ শাসনব্যবস্থাধীন আদিবাসী অঞ্চলে কায়েম করা হয় নাই।

এই ব্যবস্থার একটা ভালো দিক হচ্ছে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীগুলোর শাসনশোষণ থেকে মুক্ত রেখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংরক্ষণে রক্ষাকবচের ভূমিকা রাখে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা লাভ এবং ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির মাধ্যমে শাসন পরিকল্পনা করা হয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি। সংরক্ষিত বনাঞ্চল, সরকারী স্থাপনার নামীয় ভূমি, ব্যক্তিগত বন্দোবস্তীর অধীন যত ভূমি আছে, সবই ঐতিহ্যগত ভূমির আওতাধীন ভূমি। বলা যায় এই সমষ্টিগত মালিকানাধীন ভূমি প্রত্যেক মৌজায় রয়েছে। এই ভূমি খাস ভূমি নয়। আদিবাসীরা এই ভূমির একটা অংশে গ্রাম করে বসবাস করে, একটা অংশে চৌহদ্দি দিয়ে মৌজা বন বা গ্রাম বনাঞ্চল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়, যা থেকে গ্রামবাসীরা বাড়ীঘর নির্মাণে বিনা পয়সা বা বিনা খাজনায় ব্যবহার করে এবং অবশিষ্ট সবচেয়ে বেশী ভূমিতে গ্রামবাসীরা জুমচাষ করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। হেডম্যান ও সার্কেল চীফের মাধ্যমে জুমের খাজনা বছরের একটা দিনে (রাজপূন্যা করে) সরকারকে দেয়া হয়। এই জুমচাষের জন্য জুম চাষীর ভূমি বন্দোবস্ত নিয়ে হয় না। জুমচাষীরা একটা নির্দিষ্ট ভূমিতে একবার চাষ করলে চার বছর দখলিসত্ব থাকে। চার বছর পর উক্ত জুম চাষী সেই জায়গায় জুম চাষ না করলে অন্য যে কেউ সেখানে জুমচাষ করতে পারে। অথবা জুমচাষের পর এক বছর নিজের দখলে রেখে পরবর্তী বছরে অন্য কাউকে জুম চাষের জন্য ছেড়ে দিতে পারে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জুম চাষের ভূমি ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি নয়, এই ভূমি যৌথ মালিকানাধীন ভূমি। এটাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার, যা বংশানুক্রমে তারা ভোগদখল করে আসছে।

অনুরূপভাবে গারো ও খাসিয়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা জুমচাষ করে, পানপুঞ্জি জুম করে ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার ভোগদখল করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের সমতল অঞ্চলে প্রচলিত ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ব আইনের ২৭নং ধারায় গারো, খাসিয়া, সাওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী, হাজং, কোচ, বর্মন, মগ এবং অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ আছে। এই আইন অনুসারে ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি ব্যতিরেকে আদিবাসীদের জায়গা-জমি অআদিবাসীদের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। কিন্তু এই আইনের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে ভূমি দস্যুরা ভূমি গ্রাস করছে, শাসকশ্রেণী জোরপূর্বক অবৈধভাবে বাঙালী অভিবাসন দিয়ে যাচ্ছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় গারো জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত অঞ্চলে পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে অন্যান্য জেলা থেকে বাঙালী জনগোষ্ঠীর লোকজন পুনর্বাসন দেয়া শুরু হয়। ফলে এ অঞ্চলে গারোরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে।

একইভাবে সমতলের অন্যান্য আদিবাসীরা ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার হারাচ্ছে, নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। সর্বশেষ 'ন্যাশানাল পার্ক' ও 'ইকো পার্ক' প্রকল্প, সামাজিক বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকার গারো, খাসিয়াদের তাদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার থেকে উৎখাত করার জন্য হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। ১৯৪৭ সালের পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি গ্রাস করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০ লংঘন করে বিহার ও আসাম থেকে আসা কয়েক হাজার শরণার্থীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০ কয়েকবার সংশোধন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধভাবে বাঙালীদের পুনর্বাসন দেয়া হচ্ছে। ১৯৭৯ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে প্রায় ৫ লক্ষাধিক বাঙালীকে সমতল জেলাগুলো থেকে এনে তিন পার্বত্য জেলায় বসতি দেয়া হয়।

ভয়ংকর উদ্বেগ ও আশংকার কথা এই যে, মানবতা বিরোধী এই জবরদখলের কার্যক্রম শুধুমাত্র জুম্মদের ঐতিহ্যগত ভূমিতে দেয়া হচ্ছে না, এমনকি জুম্মদের বন্দোবস্তকৃত ভূমিতেও বসতি দেয়া হয়। ফলে এই বহিরাগত বসতিপ্রদান কার্যক্রম জুম্মদের অস্তিত্ব ও ভূমি অধিকার হুমকি ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হয়। একই সাথে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান- এই তিন পার্বত্য জেলায় সামাজিক বরায়নের নামে বনবিভাগ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান- এই তিন পার্বত্য জেলায় ২,১৮,০০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। এছাড়া শুধু বান্দরবান জেলায় দুই হাজার অস্থায়ী বাঙালীকে মাথাপিছু ২৫ একর করে মোট ৫০,০০০ একর ভূমি রাবার প্লান্টেশন ও হর্টিকালচারের নামে লীজ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য মোট ৬৫,৯৪০ একর ভূমি জবরদখল করা হয়েছে। এই ভূমি মূলতঃ আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত যৌথ মালিকানাধীন ভূমি। এছাড়া প্রতিদিন শত শত বাঙালীর অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং ভূমি বেদখলের কাজে সামিল হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ঘ খন্ডের ৪নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, জায়গা-জমি বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটা ল্যান্ড কমিশন গঠিত হবে। প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসকল জায়গা-জমি, পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে, সে সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানাস্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকবে। এই কমিশনের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি)-এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে।

এই ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন গঠন করা হয়েছে, কিন্তু ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করতে পারেনি। কাজ শুরু করার প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায় সেটেলার বাঙালীরা সেনাসদস্যদের ছত্রছায়ায় আদিবাসী জুম্মদের জমি ও পাহাড় বেদখলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে নারী ধর্ষণ হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক হামলা হচ্ছে এবং মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। উৎকণ্ঠার বিষয় এই যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য কিছু সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং মৌলবাদী রাজনীতির নেতারা অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনে মৌলবাদী প্রার্থী জয়যুক্ত করা এই অশুভ শক্তির নীতি-কৌশল।

বাংলাদেশের সমতল অঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীরা এদেশের নাগরিক। শত শত বছর ধরে এই সব জনপদে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের সাথে লড়াই করে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই সংগ্রাম করে ভূমি আবাদ করেছে। এই ভূমিপুত্র হয়ে তারা নিজস্ব উৎপাদন প্রথায় জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। আজ এতকাল পরে এই ভূমিপুত্র আদিবাসীদের বলা হচ্ছে- তারা এদেশের মানুষ নয়, তারা অনুপ্রবেশকারী বহিরাগত। অথচ আদিবাসী জনপদগুলোতে আদিবাসী ছাড়া কোন বাঙালীই ছিল না। এই তথ্য বাঙালী ইতিহাসবিদরাই ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমরা আজ নিজ দেশে পরবাসী।

সুতরাং বাংলাদেশের সকল আদিবাসী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে তার বিকাশের ধারা সামনে এগিয়ে নিতে হবে। বিকশিত এই সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজের নিজের আত্মপরিচয় অর্জন করতে হবে। শাসকগোষ্ঠীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে, এদেশে বৃহত্তর বাঙালী জনগোষ্ঠী ছাড়াও লক্ষ লক্ষ আদিবাসী মানুষ রয়েছে। তাদের নাম আছে, তাদের আত্মপরিচয় আছে, তাদের এদেশের ভূমির সাথে নিবিড় সম্পর্ক আছে, তাদের সমাজ আছে, তাদের জীবন-জীবিকার প্রথা আছে, তাদের স্বশাসন ব্যবস্থা আছে; তাদের স্বাধীনতা ছিলো, সর্বোপরি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলার মতো ইতিহাস আছে।

শাসকরা চাইলে এই মাটি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে না, তাড়িয়ে দিতে পারবে না। শাসকগোষ্ঠী চাইলে আদিবাসীদের নাম, পরিচয়, সংস্কৃতি, ইতিহাস মুছে দিতে পারবে না। আমাদের শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায় করে আত্মপরিচয় অর্জন করতে হবে। সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ভূমি অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় করে নিতে হবে। তাই আমাদের সামনে অধিকার আদায়ের আন্দোলন লড়াই-সংগ্রাম ছাড়া বিকল্প পথ নেই। ♦

জুম্ম জনগোষ্ঠী কি উপজাতি, আদিবাসী নাকি বহিরাগত?

মঙ্গল কুমার চাকমা

অতি সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলি বা জাতিগত সংখ্যালঘুরা 'উপজাতি নাকি আদিবাসী'- এই ইস্যু নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীসমূহকে 'বহিরাগত' হিসেবে প্রতিপন্ন করার পায়তারাও চলছে ব্যাপকভাবে। এর মধ্যে গত ১৯ এপ্রিল ২০০৬ এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দেয়া সরকারী সার্কুলেশন জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলেশনে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহকে (যারা নিজেদের আদিবাসী হিসেবে ভাবে) সরকারী নথিপত্রে 'আদিবাসী' হিসেবে উল্লেখ করতে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে 'উপজাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে গত ১৫-২৬ মে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ৫ম অধিবেশনে জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী মিশনের ফাষ্ট সেক্রেটারী ইসরাত জাহান চৌধুরীর বক্তব্যেও 'উপজাতীয়রা কয়েক শতাব্দীর আগে বাংলাদেশের পূর্ব দিক থেকে আগত বহিরাগতদের বংশধর' বলে উল্লেখ করা হয়। গত এপ্রিলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর কর্তৃক 'খাগড়াছড়ি ২০০১-২০০৫' নামক ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তিকায়ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীকে 'বহিরাগত' হিসেবে প্রতিপন্ন করে তাদেরকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনাকারী, বাঙালী-বিদ্বেষী, এমনকি অস্ত্র ধারনকারী, চাঁদাবাজ, অপহরণকারী ও হত্যাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এমনকি উক্ত পুস্তিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বিতর্কিত চুক্তি হিসেবেও মন্তব্য করা হয়। আরো উল্লেখ্য যে, কেবলমাত্র 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ থাকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক স্থানীয় এনজিও'র উন্নয়ন প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আটকে রাখা রয়েছে। এসব রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতা ও অপপ্রচারনার ঘটনা একটার সাথে আরেকটার কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়। সবক'টি ঘটনা গভীরতরভাবে একসূত্রে গাঁথা তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আলোচনা করা যাক উপজাতি শব্দটি নিয়ে। 'উপজাতি'[১] শব্দটি উদ্ভব হয়েছে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার উত্থান এবং আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে জাতি-বর্ণ ভিত্তিক ভাবাদর্শ থেকে। ঔপনিবেশিকতাবাদের যখন খুব রমরমা অবস্থা, তখন কিছু জনগাষ্ঠীকে 'উপজাতি' বলে আখ্যায়িত করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিরাষ্ট্র গঠনের পরও প্রভূত্বকারী জনগোষ্ঠী ও শাসকগোষ্ঠীরে নিকট এই শব্দটি ব্যবহার আরও ব্যাপক মাত্রা লাভ করে। অধীনস্থ জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকগতভাবে প্রান্তি ককরণের লক্ষ্যেই শাসকগোষ্ঠীর নিকট এ শব্দটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত জাতিরাষ্ট্রেও এ শব্দটি এখনও ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হচ্ছে।

উপজাতি বলতে এমন সব বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও বিদ্বেষপ্রসূত। যেমন- লেখ্যরূপবিহীন ভাষা, সর্বপ্রাণবাদ, আদিমতা, পশ্চাদপদতা, অসভ্য, ভবঘুরে জীবন-জীবিকা, আদিম সমাজের মানুষের মতো পশুপাখি শিকার ও খাদ্য আহরণ, খাদ্যাভ্যাসে মাংসাশী, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন, মদ্যপান ও নৃত্যে আসক্তি, জংলীপনা, সাপ-ব্যাঙ খাওয়া, পঁচা খাওয়া ইত্যাদি বিদ্বেষপ্রসূত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকেই উপজাতি অর্থে বোঝানো হয়ে থাকে। শুধু উপজাতি হিসেবে আখ্যায়িত কোনো জনগোষ্ঠী এসব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একমত পোষণ করে না তাই নয়, এসব ইন্দ্রিয়বোধবিহীন মানদন্ড আসলে প্রভূত্ববিস্তারকারী জনগোষ্ঠী ও তাদের সমর্থক প্রতিষ্ঠানগুলোর উগ্র জাতি-বর্ণ বিদ্বেষ ভাবাদর্শেরই প্রতিফলন বলে মনে করা হয়। তাই উপজাতি শব্দটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসহ কেউই গ্রহণ করতে পারে না। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানেও এই শব্দটি গ্রহণযোগ্য নয়।

এবারে আলোচনায় আসা যাক, যারা আজ নিজেদেরকে আদিবাসী বলে দাবি করছে কিন্তু সরকার তাদেরকে উপজাতি অভিধা চাপিয়ে দিচ্ছে তারা আদিবাসী কি-না। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিতর্কে না গিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞা নিয়ে তলিয়ে দেখা যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে আদিবাসী হিসেবে বিবেচনা করা যায় কি-না। জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র মি. জোসে মার্টিনেজ কোবো'র ১৯৮৪ সালে প্রদত্ত সংজ্ঞা- যা জাতিসংঘ 'ওয়ার্কিং ডেফিনিশন'[২] হিসেবে গ্রহণ করেছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে-

"আদিবাসী সম্প্রদায়, জনগোষ্ঠী ও জাতি বলতে তাদেরকে বুঝায় যাদের ভূখন্ডে প্রাক-আগ্রাসন এবং প্রাক-উপনিবেশিক কাল থেকে বিকশিত সামাজিক ধারাসহ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রয়েছে যারা নিজেদেরকে উক্ত ভূখন্ডে বা ভূখন্ডের কিয়দংশে বিদ্যমান অন্যান্য সামাজিক জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। বর্তমানে তারা সমাজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভূক্ত এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আইনী ব্যবস্থার ভিত্তিতে জাতি হিসেবে তাদের ধারাবাহিক বিদ্যমানতার আলোকে

---

[1] 'Tribe'

[2] Working definition

তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের ভূখন্ড ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ভবিষ্যত বংশধরদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মোট কথা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা বহিরাগত কর্তৃক দখল বা বসতিস্থাপনের পূর্ব থেকে নিদিষ্ট ভূখন্ডের মূল অধিবাসীর বংশধর।"[৩]

১৯৮৯ সালের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ১৬৯নং কনভেনশনে উপজাতি-আদিবাসী বলতে কাদেরকে বুঝানো হয় তা বিধৃত হয়েছে। উক্ত কনভেনশনে বলা হয়েছে যে- "স্বাধীন দেশসমূহের জাতিসমূহ- যারা এই মর্মে আদিবাসী হিসেবে পরিগণিত যে, তারা ঐ দেশটিতে কিংবা দেশটি যে ভৌগলিক ভূখন্ডে অবস্থিত সেখানে রাজ্য বিজয় কিংবা উপনিবেশ স্থাপন কিংবা বর্তমান রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণ কাল থেকে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বংশধর, যারা তাদের আইনসংগত মর্যাদা নির্বিশেষে নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ লালন করে চলেছে।"[৪]

বিশ্বব্যাঙ্কের কার্যক্রম নীতিমালায়[৫] 'আদিবাসী' শব্দটি সার্বিক অর্থে স্বতন্ত্র, ঝুঁকিগ্রস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকে ঃ (ক) একটি স্বতন্ত্র আদিবাসী সংস্কৃতির অধিকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে যারা নিজেদের মনে করে এবং অন্যরাও এই পরিচিতির স্বীকৃতি দেয়; (খ) প্রকল্প এলাকায় ভৌগলিকভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আবাসভূমি অথবা পুরুষাক্রমিকভাবে ব্যবহৃত ভূখন্ড এবং এতদঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে যাদের যৌথ সম্পৃক্ততা রয়েছে; (গ) তাদের প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের প্রধানতম সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আলাদা; এবং (ঘ) একটি আদিবাসী ভাষা রয়েছে যা সচরাচর দেশের সরকারী ভাষা বা উক্ত অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা থেকে পৃথক।

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোতে আদিবাসী জনগণের যে বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেসব বৈশিষ্ট্যকে বিন্যাস করলে দেখা যায় যে, কোন ভূখন্ডের প্রথম বসবাসকারী মূল অধিবাসীদের বংশধর হিসেবে আদিবাসীদের চিহ্নিত করা চলে; বর্তমানে প্রভূত্বকারী জনগোষ্ঠীর আগ্রাসনে তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ঔপনিবেশিক পরাধীন অবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য; অন্য কোন সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের লোকেরা উপস্থিত হওয়ার পূর্ব থেকে বা দখল করার পূর্ব থেকে বা উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব থেকে তারা বর্তমানে বসবাসকারী ভূখন্ডে সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে বসবাস করতো এবং ঐ ভূখন্ডের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের পূর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ ও ভোগদখল করতো; তারা এখনও নিজেদের বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও ভাবধারাকে মেনে চলে এবং তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের ভূখন্ড ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ভবিষ্যত বংশধরদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বর্তমানে প্রভূত্বকারী জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক সত্তার অধিকারী এবং এর ফলে তাদেরকে সংখ্যাগুরু প্রভূত্বকারী জনগোষ্ঠী থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়; তারা রাষ্ট্র ও সংখ্যাগুরু প্রভূত্বকারী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে অধীনস্থ ভূমিকায় থাকতে বাধ্য হয় এবং তারা সাধারণতঃ সাস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভেদের শিকার হয়।

মানুষ এক ভূখন্ড থেকে আরেক ভূখন্ডে, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে চলে গেছে এবং পরস্পর সংস্পর্শে এসেছে। মানুষের এই প্রবহমান গতিশীলতা ও আন্তঃসাংস্কৃতিক প্রভাব একটি বিশ্বজনিন প্রক্রিয়া। সমাজ বিকাশের প্রতিটি স্তরে দেখা গেছে যে, অধিকতর আগ্রাসী জনগোষ্ঠীগুলো তুলনামূলক ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে ও সামরিকভাবে দূর্বল গোষ্ঠীগুলির ভূখন্ডে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং দূর্বল গোষ্ঠীগুলিকে ভৌগলিক ও পরিবেশগতভাবে অধিকতর ভঙ্গুর ভূখন্ডের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিকতর ভঙ্গুর ভূখন্ডের দিকে ঠেলে দিয়ে তাদের হাতে সামান্য পরিমাণে স্বশাসনের অধিকার দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করেছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশ্বময় অগ্রগতির ফলে এই ঔপনিবেশিক আগ্রাসী নীতি আরো চরম আকার ধারণ করে থাকে। এভাবে সবল জনগোষ্ঠীগুলির পৌনঃপুনিক আগ্রাসনের ফলে কোন কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠী একই সঙ্গে বৈদেশিক ঔপনিবেশিকতা ও আভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকার শিকার হয়।

যাহোক, উপরোক্ত ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট এবং বর্ণিত সংজ্ঞায় স্বীকৃত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণ আদিবাসী কিনা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। একথা নতুন করে বলার অবকাশ নেই যে, এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলের স্বাধীন সামন্ত রাজ্য পত্তন করেছিল। মোঘল আমল এবং বৃটিশ শাসনামলে একটি

---

[3] "Indigenous communities, peoples and nations are those which having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems. In shorts, indigenous people are their descendants of their original inhabitants of a territory overcome by conquest or settlement by aliens."

[4] "Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who, inspective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions."

[5] Operational Directive (OP) 4.10

নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত তারা সেই স্বশাসন ভোগ করতো। বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিযুক্ত চিফ অফ চিটাগং মি. হেনরি ভেরোলিস্ট ১৭৬৩ সনে এক দলিলে এই রাজ্যের সীমানা উল্লেখ করেন যে, 'পশ্চিমে নিজামপুর রাস্তা (বর্তমান ঢাকা-চট্টগ্রাম রোড), দক্ষিণে সাঙ্গু নদী, পূর্বে কুকি রাজ্য (ভারতে বর্তমান মিজোরাম রাজ্য) এবং উত্তরে ফেনি নদী।

প্রাক-উপনিবেশিক যুগে এই অঞ্চল বঙ্গ দেশের অধীনস্থ বা অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে জানা যায়নি। বরং দেশের বর্তমান সিলেট, কুমিলা, চট্টগ্রামসহ বেশ কিছু অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ ছিল বলে জানা যায়। এমনকি চট্টগ্রামসহ এই অঞ্চল কখনো কখনো আরাকান রাজ্যের অধীনে চলে গেছে বলেও ইতিহাসে প্রমাণ মেলে। মোঘল ও নবাবী আমলে বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার কিয়দংশসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্পাস বা তুলা মহল হিসেবে পরিচিত ছিল। পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম জেলার ব্যবসায়ীদের সাথে পার্বত্য এলাকার আদিবাসী জুম্মদের পণ্য বিনিময় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে চাকমা রাজারা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কার্পাস বা তুলা চট্টগ্রামের মোঘল রাজপ্রতিনিধিকে প্রদান করতেন। এ 'কার্পাস শুল্ক' কোন করদরাজ্যের কর ছিল না।[৬]

দ্বিতীয়তঃ সমগ্র ভারত বর্ষ দখলের এক পর্যায়ে ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে নজর দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ শাসকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশ কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করে। সর্ব প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে আক্রমণ করে ১৭৭৭ সালে। জুম্ম জনগণ সেই আক্রমণ বীরত্বের সাথে প্রতিহত করে থাকে। এরপর ১৭৭৮, ১৭৮০ ও ১৭৮২ সালে পর পর বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু এক পর্যায়ে জুম্মদের অভিজাত শ্রেণীর একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তৎকালীন রাজা জানবক্স খাঁ দুর্বল হয়ে পড়েন এবং ১৭৮৭ সালে বৃটিশদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। জুম্ম জাতির কাঁধে পরাধীনতার জোয়াল বস্তুতঃ তখন থেকেই ধীরে ধীরে জেঁকে বসতে শুরু করে। তখন থেকেই একের পর এক শাসনামলে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে জুম্ম জাতির স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হতে থাকে এবং জুম্ম জনগণের স্বশাসন অধিকার লুণ্ঠিত হতে থাকে।

উল্লেখিত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান যে, প্রাক-উপনিবেশিক যুগ থেকে অর্থাৎ ব্রিটিশরা আসার আগে থেকেই একমাত্র জুম্ম জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরাই পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করতো এবং তারা ছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম। আর বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আইএলও ১০৭নং কনভেনশন ও মার্টিনেজ কোবোর সংজ্ঞা অনুসারে "অন্য কোন সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের লোকেরা উপস্থিত হওয়ার পূর্ব থেকে বা দখল করার পূর্ব থেকে বা উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব থেকে যারা বর্তমানে বসবাসরত ভূখন্ডে সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে বসবাস করতো এবং ঐ ভূখন্ডের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যাদের পূর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ ও ভোগদখল করতো" তারাই আদিবাসী হিসেবে বিবেচিত।

মি. হেনরি ভেরোলিস্ট-এর বর্ণনা মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি একসময় বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার কিয়দংশ এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো এদেশেও অধিকতর আগ্রাসী বৃহত্তর বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের আর্থিক ও সামাজিক দূর্বলতার সুযোগে বর্তমান রাউজান, রাঙ্গুনীয়া ইত্যাদি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তাড়িয়ে নিতে নিতে বর্তমান পর্বত-সংকুল ও অধিকতর ভঙ্গুর পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ফলে ক্রমে ক্রমে বর্তমান প্রভূত্বকারী বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর অভিবাসনের ফলে জুম্ম জনগোষ্ঠীসমূহ অপ্রধান ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ছে। তাদের স্বশাসন ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের শাসনামলে ক্রমে ক্রমে হস্তক্ষেপ হতে থাকে এবং এক সময়ে পূর্ণমাত্রায় ছিনিয়ে নেয়া হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলা হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে জুম্মদের স্বশাসন ছিনিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং তা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসনামলে এসে পূর্ণমাত্রা লাভ করে। উপরোক্ত বিশ্লেষণে বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে দশ ভাষাভাষী জুম্ম জনগোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষরাই এই অঞ্চলের প্রথম বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। উল্লেখ্য যে, জুম্মদের মধ্যে লাঙ্গল চাষ প্রবর্তনের লক্ষ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষান্তে চাকমা রাজা কর্তৃক কয়েক পরিবার বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি প্রদান করা হয়। ১৯৪১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আড়াই লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র আড়াই শতাংশের মতো (৭,২২০ জন) যারা অআদিবাসী বাঙালী ছিল তারা ছিল সেই বসতিকারী বাঙালীদেরই বংশধর মাত্র।

পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসনামলে ও অধুনা বাংলাদেশের শাসনামলে, বিশেষ করে ১৯৭৯ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে সরকারী উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ মুসলমান বাঙালী বসতি প্রদানের মাধ্যমে জুম্ম জনগোষ্ঠী নিজ দেশে পরবাসী হয়ে পড়েছে। এ অঞ্চলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাঙালীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সামগ্রিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালীরা প্রভূত্বকারী জনগোষ্ঠীতে রূপান্তিরিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এসব প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের কাছে জুম্ম জনগোষ্ঠীসমূহ অধীনস্থ ভূমিকায় থাকতে বাধ্য হচ্ছে এবং নানা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বৈষম্য এবং হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

---

[6] 'The Chakma Tribe of Chittagong Hill Tracts in the 18th century: Journal of Royal Asiatic Society, No- 1, 1984' by Dr. A.M. Serajuddin and 'Chakma Resistance to British Domination' by Dr, Sunity Bhushan Kanungo

দশ ভাষাভাষী আদিবাসী জুম্মদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান প্রভূত্বকারী বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। তাদের শারীরিক ও মানসিক গড়ন ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যতা প্রভূত্বকারী বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী থেকে সহজে চিহ্নিত করা যায়। তারা প্রভূত্বকারী জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বহন করে। তারা এখনো নিজেদের বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, ভাবধারা ও মূল্যবোধকে মেনে চলে। যেমন জুম্ম জনগণের রাজা-হেডম্যান-কার্বারী সম্বলিত তিনস্তর বিশিষ্ট প্রথাগত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনা, সামাজিক রীতিনীতি ও বিচার ব্যবস্থা, পদ্ধতি ইত্যাদি এখনো বলবৎ রয়েছে এবং জুম্ম জনগণের সামগ্রিক জীবনধারায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ভূখন্ড ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ভবিষ্যত বংশধরদের হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। এলক্ষ্যে তারা বৃটিশ শাসনামল থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে তাদের জন্মভুমি ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংজ্ঞানুসারে ঔপনিবেশিকতার শিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, যাদের সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়, যাদের স্বকীয় নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ধরে রাখার প্রচেষ্টা রয়েছে তাদেরকে আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আন্তর্জাতিকভাবে আদিবাসী বলতে যাদের বোঝানো হচ্ছে সেই অর্থে বাংলাদেশে উপজাতি নামে যে সকল জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হচ্ছে তাদের সকলকে আদিবাসী হিসেবে নিঃসন্দেহে গণ্য করা যায়। বস্তুতঃ কোনো ভূখন্ডে কোন জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ প্রথম বসতিকারী ছাড়াও আরেকটি বিচার্য মৌলিক বিষয় হলো, যেসকল জনগোষ্ঠী তথাকথিত সভ্যতার শিকার হয়ে রাষ্ট্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে এবং যাদের উপজাতি, আদিম ইত্যাদি বিদ্বেষমূলক আখ্যায় আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বস্তুতঃ তারা সকলেই আদিবাসী হিসেবে বৈধ দাবিদার।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে দশ ভাষাভাষী জুম্ম জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূখন্ডে প্রথম অধিবাসী ও মূল ভূমিপুত্রের বংশধর। জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র মি. মার্টিনেজ কোবো তাঁর 'আদিবাসীর উপর বৈষম্য সংক্রান্ত গবেষণাপত্রে' উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশ সরকারও 'নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বংশধর হিসেবে' বাংলাদেশের উপজাতীয়দেরকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকার করেছে।[৭]

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র গোড়া থেকেই এসব জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে অস্বীকার করে আসছে। কিন্তু বৃটিশ, পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশে অনেক আইনে ও সরকারী দলিলে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার রয়েছে বা ব্যবহার হয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে, ১৮৭৪ সালের তফসিলভূক্ত জেলা আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন তফসিলভূক্ত জেলাগুলিতে ভূমির উপর আদিবাসীদের যৌথ ও ব্যক্তি মালিকানাস্বত্বসহ বিশেষ শাসন ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হয়। পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালের এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এসব আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা বা অঞ্চলসমূহের জন্য "পৃথক শাসিত এলাকা" বা "শাসন বহির্ভূত এলাকা" নামে বিশেষ শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনে আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা বা অঞ্চলসমূহের বিশেষ শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা দেশ বিভাগের পর ভারত ও পাকিস্তানে অব্যাহত রাখা হবে মর্মে বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়।[৮] একইভাবে পাকিস্তান আমলে প্রণীত ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনেও আদিবাসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাদের বিশেষ অধিকার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের প্রথম তফসিলে 'অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন'-এর মধ্যে উক্ত পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন সর্বাগ্রে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তাই বলা যেতে পারে যে, দেশের সংবিধানে পরোক্ষভাবে আদিবাসীদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

ব্রিটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এই অঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক শাসনতান্ত্রিক ও আইনি দলিল হিসেবে স্বীকৃতি। এই শাসনবিধি এখনো চালু রয়েছে। উক্ত শাসনবিধির ৪, ৬, ৩৪, ৪৫, ৫০ প্রভৃতি ধারায় 'আদিবাসী পাহাড়ী'[৯] হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত শাসনবিধির তফসিলে উল্লেখিত বিভিন্ন আইনসমুহের মধ্যে দি ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯২২, দি ইন্ডিয়ান ফিনান্স এ্যাক্ট ১৯৪১, দি ফরেষ্ট এ্যাক্ট ১৯৭২[১০] প্রভৃতির ক্ষেত্রেও 'আদিবাসী পাহাড়ী'[১১] শব্দটি উল্লেখ ছিল। বিশেষতঃ দি ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯২২ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে- "আদিবাসী পাহাড়ী ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে দি ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯২২ প্রযোজ্য হবে।"[১২]

---

[7] Mr. Martinez Cobo in his `Study of the Problems of Discrimnation Against Indigenous Populations' states, "In Bangladesh, the Government state that the members of tribal of semi-tribal populations are regarded a indigenous 'on account of their descent from the populations which are settled in specified geographical areas' of the country."

[8] আদিবাসী হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী প্রসঙ্গে - গৌতম কুমার চাকমা

[9] 'Indigenous Hillman'

[10] The Indian Income Tax Act of 1922, The Indian Finance Act of 1941, The Forest Act of 1972 etc

[11] 'Indigenous Hillman'

[12] "The Indian Income Tax Act of 1922 shall apply to all person in the Chittagong Hill Tracts except the indigenous hillmen."

উক্ত আইনটির বদৌলতে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের শাসনামলেও 'আদিবাসী পাহাড়ী'-এর ক্ষেত্রে আয়কর প্রযোজ্য নয় বলে বিভিন্ন সরকারি পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিলের ২৭নং অনুচ্ছেদে তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয় ১৯৯৫ সালের বিএনপি সরকারের আমলে। ১৯৯৫ সালে জাতীয় সংসদে প্রণীত ১২নং আইনে এবং এ আইনের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১২ জুলাই ১৯৯৫ জারিকৃত সরকারি পরিপত্রেও 'আদিবাসী পাহাড়ী' উল্লেখ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে ২০০২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী পরিপত্রে একটি প্রকল্প কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালায় আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করা হয়।[১৩]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখা কর্তৃক স্মারক নং সংস্থাপন (এডি-২)-৩৯/৯১-১৪৩ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ মূলে আইএলও'র আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী কনভেনশন কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) বিভাগের ইস্যুকৃত পরিপত্রেও 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয় যে, "চট্টগ্রামে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী ও উপজাতির জন্য চাকুরির বয়স-সীমা স্বাভাবিক বয়স-সীমার তুলনায় ১০ বৎসর এবং শ্রমসাধ্য কর্মের ক্ষেত্রে ৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিল করা হইয়াছে।" গত ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় আদিবাসী সমন্বয় কমিটির প্রকাশনা 'সংহতি ২০০০'-এ প্রদত্ত বাণীতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আদিবাসী' শব্দটি এবং বাংলাদেশে বিশ লাখ আদিবাসী রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেন যে-

"বাংলাদেশের বিশ লাখ আদিবাসীসহ বিশ্বের ত্রিশ কোটি আদিবাসী জনগণকে এ উপলক্ষ্যে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ...বাংলাদেশে চাকমা, খাসি, গারো, মারমা, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, উঁরাও, মুণ্ডা, হাজং, কোচ, চাক, রাখাইন, মুণিপুরীসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরো অনেক জাতিসত্তার মানুষ আবহমান কাল ধরে বসবাস করে আসছে। মুক্তি যুদ্ধের সময় এ আদিবাসীদের অবদান ছিল গৌরবের। আদিবাসীদের গান, গল্প, উপকথা, মুখে মুখে চলে আসা সাহিত্য, বৈচিত্রময় নৃত্য ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সম্ভার আমাদের মূল্যবান সম্পদ।"

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও একইভাবে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে 'সংহতি ২০০৩'-এ প্রদত্ত বাণীতে 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেন যে-

"আমাদের জনগোষ্ঠীরই একটি অংশ আদিবাসী। আদিবাসীরাও আর সকলের মতো সমান মর্যাদাসম্পন্ন বাংলাদেশের নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধে যেমন দেশগঠনেও তেমনি আদিবাসীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। আদিবাসীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে আমরা বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছি। আদিবাসীদের রয়েছে এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, বৈচিত্রময় সংস্কৃতি। এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় সম্পদ।"

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, সরকারী বিভিন্ন আইন, পরিপত্র ও দলিলে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করলেও সরকার এখনো পর্যন্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে চলেছে। বিশেষতঃ জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে 'বাংলাদেশে আদিবাসী নেই' বলে সরকার স্ববিরোধী বিবৃতি দিয়ে আসছে। সরকারের এই বক্তব্য কোনো জোরালো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মূলতঃ আদিবাসী জনগণকে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার হীন উদ্দেশ্যেই সরকার এ নীতি গ্রহণ করে চলেছে।

আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সমমর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার যেখানে ব্যাপক প্রয়াস চলছে, সেখানে বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকার না করার প্রধানতম ভয় হলো এই স্বীকৃতির মাধ্যমে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি অঙ্গীকার করার সামিল হবে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আদিবাসী অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারও বাধ্য হবে। তাই এই অধিকার থেকে বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের যাতে বঞ্চিত রাখা যায় সেজন্যই এদেশে আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ার সরকারের অগণতান্ত্রিক প্রয়াস চালিয়ে আসছে এবং আদিবাসীদের উপর দমন-পীড়ন-বৈষম্য তথা অধিকার হরণের ইতিহাসকে সরকার গোপন করার নানাভাবে ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকার এই অগণতান্ত্রিক ও মানবতা বিরোধী কাজটি করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামেও বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছে। তন্মধ্যে এবছর জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী মিশনের বক্তব্যে এই ফোরামকে অবমাননাকর ভাষায় 'টক-শো' বলে উল্লেখ করা এবং বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী আদিবাসী নেতৃবৃন্দের উত্থাপিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে অসৌজন্যমূলক ভাষায় সরাসরি 'বানোয়াট' বলে অভিহিত করার ঘটনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত ভাষায় আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামকে 'টক-শো' বলে মন্তব্য করার ফলে অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী অনেকেই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। বিশেষ করে আদিবাসী বিষয়ক ফোরামের অন্যতম সদস্য ও কানাডিয়ান আদিবাসী নেতা ওয়ালি লিটলচাইল্ড এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং কোনটা বানোয়াট আর কোনটা বস্তুনিষ্ট তা তদন্তের আহ্বান জানান। ফোরামের

---

[13] পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি আদিবাসী নয়, উপজাতি' শীর্ষক সংবাদ, দৈনিক আমার দেশ, ১৩ মে ২০০৬।

চেয়ারপার্সন মিজ ভিক্টোরিয়া টাউলি-কর্পুজ তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর সরেজমিন সফরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন, সরকার রাজী থাকলে ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ে ফোরামের সদস্য হিসেবে তারা পূর্ণ সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত রয়েছে। এমনকি সরকার ও আদিবাসীদের মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠানে ফোরাম মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করতেও প্রস্তুত বলে তিনি জানান। এসব তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কোন ইতিবাচক উত্তর দিতে সৎসাহস দেখাতে ব্যর্থ হন আমাদের সরকারী প্রতিনিধি।

বলাবাহুল্য দেশের কতিপয় আইনে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে 'উপজাতি' হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের কথা সরকারের কর্তাব্যক্তিরা ও শাসকগোষ্ঠীর মদদপুষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। বলা যায় এসব আইনে জুম্ম জনগণকে জোর করে 'উপজাতি' অভিধা গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কর্তৃক গণপরিষদে উথাপিত দাবীনামা ও পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতি তাঁর মূল পাঁচদফা দাবীনামায় দশ ভাষাভাষি এগারটি জাতিগোষ্ঠীকে 'জুম্ম' হিসেবে অভিহিত করার দাবী তুলে ধরেন। এমনকি পরবর্তীতে সরকারের অনঢ় অবস্থানের কারণে জনসংহতি সমিতি 'পাহাড়ী' হিসেবে অভিহিত করারও প্রস্তাব রাখে। কিন্তু সরকার পক্ষ কোনটাই গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি। অবশেষে সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আশু সমাধানার্থে তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে জনসংহতি সমিতি ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'উপজাতি' শব্দটি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আইএলও'র ১০৭নং কনভেনশনে বলা আছে যে, উপজাতি জনগোষ্ঠী যে অধিকার ভোগ করার অধিকার রাখে আদিবাসীরাও সেই একই অধিকার ভোগ করার অধিকারী হবে। এখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহকে উপজাতি হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে বর্তমান সময়ে সরকার উপজাতি অভিধা নিয়ে যতই বলে সোচ্চার রয়েছে, রাষ্ট্র কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আইএলও'র ১০৭নং কনভেনশন বাস্তবায়নে সোচ্চার থাকতে দেখা যায় না। উক্ত কনভেনশনের মাধ্যমে সরকারী ভাষায় উপজাতিদেরকে তাদের ভূমির উপর ব্যক্তিগত ও যৌথ মালিকানা এবং প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং তাদের পূর্ব সম্মতি ব্যতিত তাদের ভূখন্ড থেকে তাদেরকে সরিয়ে নেয়ার কোন এখতিয়ার নেই রাষ্ট্রের। উক্ত কনভেনশন মোতাবেক উপজাতি-আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার রয়েছে। অথচ অনুস্বাক্ষর করার ফলে বাংলাদেশ এসব অধিকার বাস্তবায়ন করতে এবং দেশীয় আইনসমূহকে তদনুসারে সংশোধন করতে বাধ্য।

আরেকটা বিষয় এখানে খবুই তাৎপর্যপূর্ণ। তা হলো আত্মপরিচয়ের প্রেক্ষাপট থেকেই এই ইস্যুটাকে দেখতে হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহ যেখানে 'আদিবাসী' হিসেবে আত্মপরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে সেখানে রাষ্ট্র বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কর্তৃক তাদেরকে 'উপজাতি' পরিচয় চাপিয়ে দেয়া কোন গণতান্ত্রিক ও সভ্য সমাজের নীতি হতে পারে না। জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক মার্টিনেজ কোবো, বিশ্বব্যাংক, আইএলও ও এডিবি'র সংজ্ঞায় এই আত্মপরিচয়ের দিকটাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এসব সংজ্ঞায় বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মতামতকেই অন্যতম ভিত্তি হিসেবে ধরে নিতে হবে তারা নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে বলতে চায় কিনা। তাদের মতের বিরুদ্ধে কারোরই অধিকার নেই সংশিষ্ট জনগোষ্ঠীকে 'উপজাতি' বা 'আদিবাসী'র অভিধা চাপিয়ে দেয়ার।

যুক্তি আসতে পারে, বাঙালী জাতিও এ মাটির আদি বাসিন্দা বা আদিবাসী। তারা প্রাক-উপনিবেশিক কাল থেকে এদেশের অপরাপর অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। তারই আলোকে সরকারী বক্তব্যে বলা হয়ে আসছে যে, বাংলাদেশে আদিবাসী-অআদিবাসী বলে কিছু নেই। এখানে সবাই আদিবাসী। এদেশের বাঙালীদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, তাদের পূর্বপূরুষরা এদেশের পশ্চিমে অবস্থিত দেশগুলো থেকে এদেশে এসেছে। অনেকেই এই ভেবে গর্ববোধ করেন যে, বাঙালীদের পূর্বপুরুষরা শক্তির জোরে এ দেশকে দখল করেছিল। পূর্বপুরুষরা যে আরবি ভাষাভাষি দেশগুলো (ইরান অথবা উত্তর ভারত থেকে অভিবাসী) এ কথা ভেবেও তারা আত্মতুষ্টি অনুভব করেন। তাদের ধারণা এসব এলাকার মানুষ প্রায় সবাই লম্বা ও ফর্সা এবং তথাকথিত উন্নত সংস্কৃতিব উত্তরাধিকারী। অন্যদিকে বাংলাদেশসহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষের পূর্বপুরুষের মধ্যে আদিবাসীর অস্তিত্ব আছে বলে অনেকে মনে করেন। ধ্রুপদী ধারার নৃতাত্ত্বিকদের বিচারে এরা হয় অস্ট্রো-মঙ্গোলয়েড অথবা মঙ্গোল-দ্রাবিড়ীয় পরিবারের মানুষ। নৃতাত্ত্বিকদের বিচার বিশ্লেষণ যদি সত্য হয় তবে গড়পড়তা বাঙালীর আদিপুরুষ হয় সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরা, গারো, রাখাইন বা অন্য কোন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর দলভূক্ত হবে।[১৪] তাই বলা যায় যে, বাঙালী জাতি একটি শংকর জাতি- যাদের রক্তে আদিবাসী শেখড় গ্রোথিত রয়েছে। আদিবাসী ধারা গ্রোথিত থাকলেও বাঙালী জাতি এখন এদেশে বৃহত্তর বা মূল জনগোষ্ঠীতে[১৫] রূপান্তরিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের পূর্ণ কর্তৃত্বে। তারা বর্তমানে এদেশে প্রভূত্বকারী

---

[14] Cultural Rights of Adivasi Peoples and the Indigenous Roots of Bengali Culture, Devasish Roy, Amani Kok, Hill Tracts NGO Forum, August 2002

[15] Mainstream people

জনগোষ্ঠী। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনধারা জাতীয় আইন ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়; কোন প্রথাগত আইন বা ব্যবস্থাপনা দ্বারা নয়। সুতরাং এখানে বাঙালী জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' অভিধায় অভিহিত করা না করার বিষয়টি অবান্তর।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহকে আদিবাসী হিসেবে ও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দিলে কখনোই দেশের অখন্ডতা বিপন্ন হবে না বরং তারা নিজেদেরকে গভীরভাবে বাংলাদেশী সমাজের অখন্ড অংশ হিসেবে মনে করবে। সাংবিধানিক সুরক্ষার মাধ্যমে আদিবাসীরা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যে দাবী করে আসছে তা প্রতিক্রিয়াশীল বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে চালিয়ে দেয়া হয়। যদি আদিবাসীরা বা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব পোষণ করতো তাহলে তারা তাদের রাজনৈতিক নিষ্পত্তি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বাইরে চাইতো, এর ভেতরে নয়। কিন্তু জুম্ম জনগণ বরাবরই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের মধ্যে সমাধানের দাবী করে আসছে। তাই জুম্ম জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম অখন্ডতাবাদী সংগ্রাম, বিচ্ছিন্নবাদী সংগ্রাম নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব তখনই উদ্দীপ্ত হয় যখন প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক প্রথার মাধ্যমে ন্যায়বিচার মেনে চলে অখন্ডতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়।[১৬]

আরো প্রশ্ন আসতে পারে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দিলে বাঙালী জাতি প্রকারান্তরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত হবে। বলাবাহুল্য দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.৫% ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে বৃহত্তর বাঙালী জাতি কখনোই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার এবং প্রান্তিক বা অপ্রধান জনগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। বাঙালী জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার কোন আশঙ্কা থাকতে পারে না। জনসংখ্যার মাত্র ১.৫% ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধীনে বাঙালী জাতি পরাধীন অবস্থায় পর্যবসিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ভাবতে পাবে না। পক্ষান্তরে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হবে এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে। বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়ায় এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে। আত্মনিয়ন্ত্রিত[১৭] উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি তথা দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী ত্বরান্বিত হতে বাধ্য। বিশেষ সংরক্ষণমূলক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সমুন্নত ও রক্ষিত হবে। এতে করে এদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা ও নৃতাত্ত্বিক বহুমাত্রিকতা অধিকতর সমৃদ্ধশালী হবে।

বস্তুতঃ বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় যেই শাসনকাঠামো হোক না কেন দেশের পশ্চাদপদ সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বা জাতিসমূহের জন্য বিশেষ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা আত্মনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্ব-শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে আসছে। যুক্তরাজ্য একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও মোট জনসংখ্যার ৯.২% অধিবাসী ও মোট আয়তনের ৩২% অঞ্চল নিয়ে গঠিত স্কটল্যান্ডের জন্য একটি উন্নত স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। অনুরূপভাবে ইতালির জার্মান-ভাষী দক্ষিণ টাইরল[১৮]এর মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭৫% (৪,৩৩,২২৯ জন, ১৯৮১ সনের আদমশুমারী অনুসারে) অধিবাসীদের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদান পূর্বক অধিকতর স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করা হয়েছে। মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৪৬% (২২,৯০০ জন) সুইডশ-ভাষী ফিনিশ নাগরিক অধ্যুষিত এলান্ড দ্বীপপুঞ্জেও[১৯] ফিনল্যান্ড সরকার স্বায়ত্বশাসন প্রদান করেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে সংঘশাসিত রাজ্য, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, উপজাতি অঞ্চল নামে বিভিন্ন স্তরের স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে পাকিস্তানেও খাইবার, কোরাম, মালকান্দ ইত্যাদি এলাকায় উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল নামে পৃথক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে।[২০]

বাংলাদেশ একটি গণতন্ত্র-কামী রাষ্ট্র হিসেবে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের স্বার্থে বাংলাদেশ সরকারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী স্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে এগিয়ে আসবে; সর্বোপরি এসব জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি দিয়ে সরকার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাবে বলে আদিবাসী জনগণ কামনা করে।♦

---

[16] Cultural Rights of Adivasi Peoples and the Indigenous Roots of Bengali Culture, Devasish Roy, Amani Kok, Hill Tracts NGO Forum, August 2002

[17] Self-determined

[18] South Tyrol

[19] Alland Islands

[২০] সংশোধিত পাঁচদফা দাবীনামার উপর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত বক্তব্য এবং তৎপ্রেক্ষিতে সমিতির মতামত (প্রত্যুত্তর), পৃষ্ঠা-২২/২৩।

প্রসঙ্গ ঃ 'অরক্ষিত হয়ে পড়ছে তিন পার্বত্য জেলার সীমান্ত'

গৌতম কুমার চাকমা

আমার দেশ পত্রিকায় শনিবার ১ জুলাই ২০০৬ ইংরেজী "অরক্ষিত হয়ে পড়ছে তিন পার্বত্য জেলার সীমান্ত" শিরোনামে জহিদুল করিম কচি চট্টগ্রাম বুরো কর্তৃক লিখিত সংবাদ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। উক্ত সংবাদে বলা হয়েছে "পার্বত্য চট্টগ্রামের ৪৭৯ কিলোমিটার সীমান্ত প্রায় অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। ফলে তিন পার্বত্য জেলা রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান দিয়ে অবাধে সীমান্তের ওপার থেকে প্রতিদিন আসছে আগ্নেয়াস্ত্র ও ফেনসিডিল। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে ৫৮টি সীমান্ত ফাঁড়ি স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী বরাবরে সুপারিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।"

উক্ত সংবাদে আরো বলা হয়েছে যে "বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলার সঙ্গে মিয়ানমার ও ভারতের ৭১০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এ সীমান্ত এলাকার মধ্যে ৪৭৯ কিলোমিটার এলাকায় বর্তমানে কোনো নিরাপত্তা ক্যাম্প নেই। রাংগামাটি জেলার সাজেক থেকে খাগড়াছড়ি জেলার নাড়াইছড়ি পর্যন্ত ১১৩ কিলোমিটার, বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার মদক থেকে ঘুমধুম পর্যন্ত ১২১ কিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিডিআর) ও নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো অস্তিত্ব নেই। উল্লিখিত সীমান্ত এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সীমান্ত চৌকি না থাকায় আন্তর্জাতিক চোরাচালানী চক্র অস্ত্র ও মাদক দ্রব্য অবাধে নিয়ে আসছে। তদুপরি এসব অস্ত্র তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন সংগ্রহ করে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সূত্রে জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা, ইউপিডিএফের সশস্ত্র শাখা জুম্ম ন্যাশন্যাল লিবারেশন আর্মি (জেএনডি), মিয়ানমার বিচ্ছিন্নতাবাদী দল আরাকান আর্মি (এএ), সন্ত্রাস দমন কমিটি (সদক), ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব আরাকান (ডিপিএ), রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গ্যানাইজেশন (আরএসও), আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট, মিজো বাহিনী, অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ), এনএলএফটি সীমান্ত পথে এগুলো পাচার ও ব্যবহার করছে।"

উক্ত সংবাদ পাঠে মনে হতে পারে যে, সত্যিই পার্বত্য চট্টগ্রামের উক্ত সীমান্ত অরক্ষিত এবং ঐ এলাকা দিয়ে প্রচুর ফেনসিডিল ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রবেশ করে। আর তা প্রতিরোধে উক্ত ৫৮টি সীমান্ত ফাঁড়ি স্থাপন যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয় এবং সীমান্ত ফাঁড়ি বাড়ানোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কার্যত সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বলা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৪৭৯ কিলোমিটার সীমান্তে বর্তমানে কোনো নিরাপত্তা ক্যাম্প নেই। এ তথ্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন নাড়াইছড়িতে পাকিস্তান আমল হতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প রয়েছে। এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্বে এ এলাকার উল্টাছড়ি ও ধনপাতায় স্থাপিত বিভিন্ন ক্যাম্প এখনো রয়েছে। ভারতের মিজোরাম সীমান্তবর্তী রাংগামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক এলাকায় রুইলুই ও বেটলিংসহ চারটি জায়গায় ক্যাম্প রয়েছে। এ ছাড়া সাজেক এলাকার পার্শ্ববর্তী বরকল উপজেলার হরিণা, বরকল, ঠেগা ও আন্দারমানিক সীমান্ত এলাকায় কমপক্ষে ১৫ (পনের) টি ক্যাম্প এখনো রয়েছে। অনুরূপভাবে মিয়ানমারের আরাকান সীমান্তে রুমা উপজেলা ও থানচি উপজেলায় কয়েকটি ক্যাম্প রয়েছে।

বলা হয়েছে এ সব সীমান্ত দিয়ে ফেনসিডিল ও অন্যান্য ড্রাগ পাচার করা হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় সীমান্ত দিয়ে ফেনসিডিল পাচার করা হয়ে থাকে বলা হলে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য হতো। কারণ ঐ সীমান্ত দিয়ে ফেনসিডিল পাচার সহজ ও লাভজনক হতে পারে। কারণ ঐ এলাকা সমতল ও চট্টগ্রাম জেলার পাশে অবস্থিত বিধায় সারা দেশে ফেনসিডিল পাচারের সুবিধা রয়েছে। কিন্তু হিমালয়-হিন্দুকুশ পর্বতমালার শাখা-প্রশাখার উঁচু পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত ও অধিকাংশ সংরক্ষিত বনাঞ্চল আবৃত এলাকার দূর্গম পথে বিশেষতঃ ফেনসিডিল পাচার কতটুক সম্ভব আর ব্যবসায়িক দিক থেকে কতটুকু লাভজনক হতে পারে তা সহজে অনুমেয়। বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের যে এলাকায় গড়ে প্রতি এক মাইল বা দুই মাইল অন্তর ক্যাম্প রয়েছে এবং যেখানে সেনা, বিডিআর, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ও আনসার বাহিনীর হাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে সেখানে এসব পাচার কতটুকু সম্ভব তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। আরো উল্লেখ্য যে, এসব এলাকার আদিবাসী পাহাড়ী ও সরকারের পরিকল্পনাধীনে বসতিকারী বাঙালী সেটেলারগণ ফেনসিডিল ব্যবহারের সাথে তেমন সম্পৃক্ত বলে এখনো শুনা যায় নি।

বলা হয়েছে এসব এলাকা দিয়ে অস্ত্র পাচার হয়ে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে। সাম্প্রতিককালের সংবাদের বিভিন্ন সুত্রের প্রেক্ষিতে এটা বলা যেতে পারে যে, সীমিত সংখ্যক ছোট ছোট অস্ত্র যেমন- পিস্তল, রিভলভার, পাইপগান, টুট রাইফেল জাতীয় বিশেষতঃ মিজোরাম সীমান্ত দিয়ে কখনো সখনো পাচার হয়ে থাকতে পারে। তবে মিয়ানমার হতে দূর্গম পর্বতমালা ডিঙিয়ে থানচি বা রুমা উপজেলা দিয়ে কোন ধরনের অস্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে পাচার সম্ভব নয়। বিশেষতঃ মিয়ানমারের বিভিন্ন সশস্ত্র দলের ও আমাদের দেশের সেনা ও বিডিআর-এর অসংখ্য ক্যাম্প এড়িয়ে তা কখনো করা যেতে পারে না। অবশ্য বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সীমান্ত দিয়ে ও কক্সবাজারের টেকনাফ হয়ে অস্ত্র পাচার সম্ভব হতে পারে। উল্লেখ্য ঐসব এলাকা কার্যত রোহিঙ্গ্যা শরণার্থীদের দখলে রয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অনুপ্রবেশ ও বসতি সম্প্রসারণের কারণে এবং সেই সাথে বিভিন্ন ধরনের তৎপরতার কারণে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী আদিবাসীদের নয় সারা দেশের জন্য কি পরিণাম হতে পারে তা অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত বিষয়ে ভাবতে গিয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি ও রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে কোন আলোচনা করেছেন বলেও মনে হয়নি।

গোয়েন্দা সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা রয়েছে এবং তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী- এ ধরনের পুরনো কাসুন্দি না শোনা ভাল। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ী ও স্থায়ী বাঙালীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা সেটেলার বাঙালীসহ সকলের সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অপরপক্ষে এর বিরোধিতা না করলে বা জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে দু' কথা না বললে কি করে হয়? মিয়ানমার ও ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী বা বিদ্রোহীদের অপতৎপরতা দমনের ইঙ্গিত করে সীমান্ত ফাঁড়ি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সে বিষয়ে না বলা ভালো। তবে একথা সত্য সীমান্ত ফাঁড়ি না বাড়িয়েও আমাদের বীর সেনাবাহিনী দেশের যে কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার শক্তি, সাহস ও দক্ষতা রাখে। উপরোক্ত বিষয়াবলী হতে এটা সুস্পষ্ট যে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৫৮টি সীমান্ত ফাঁড়ি স্থাপনের সুপারিশ কার্যত অবান্তর। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে তা কি নিতান্তই অমূলক? কথায় আছে কারণ ব্যতিরেকে কার্য হয় না। এ ক্ষেত্রেও তা সত্য। তবে ৫৮টি ফাঁড়ি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপট এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সৃষ্টির মূলে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ, কৃষিজ, উদ্যানজাত, মৎস্যজাত ও অন্যান্য সম্পদ লুণ্ঠনকারী ব্যবসায়ী, অস্থানীয় আমলাদের অন্যায়-অবিচার এবং সর্বশেষে সরকারের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সরকারি পরিকল্পনাধীনে বসতিকারী বাঙালি সেটেলারগণ কর্তৃক ব্যাপকহারে পাহাড়ী অধিবাসীদের মালিকানাধীন ও দখলাধীন জমি ও ভিটেমাটি জবরদখল। এ প্রেক্ষিতে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তা সবারই জানা। পরিশেষে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কার্যতঃ চুক্তি বাস্তবায়ন না করলেও ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক বাস্তবায়নের পক্ষে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ীদের শাসন সংক্রান্ত ইতিহাস ও তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনা সম্পর্কে যারা অবহিত তারা সকলে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের পক্ষে রয়েছেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় যারা এখনো প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং যারা উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও উগ্র ইসলামিক ভাবাদর্শবশতঃ আদিবাসী পাহাড়ীদের অস্তিত্ব বিলুপ্তকরণে আগ্রহী এবং সর্বোপরি আদিবাসী পাহাড়ীদের ন্যায্য অধিকারের পরিবর্তে প্রতিবেশী দেশের আগ্রাসনের ভূতকে যারা কল্পনা করে থাকেন তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতা করে আসছেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে স্বীয় স্বার্থে কিংবা অন্য কোনপ্রকার চিন্তার প্রভাবে জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী এবং কখনো কখনো আত্মঘাতী অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছেন। উক্ত ৫৮টি সীমান্ত ফাঁড়ি স্থাপনের সুপারিশও এ ধরনের অপচেষ্টারই অংশ বিশেষ।

জানা গেছে বিগত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অন্যান্য কতিপয় সিদ্ধান্তের সাথে উক্ত ৫৮টি ফাঁড়ি স্থাপনের বিষয়টিও ছিল। তবে উক্ত বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী শ্রী মনিস্বপন দেওয়ান অনুপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের মে মাসে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার নির্বাচনী এলাকা হতে ২০০১ সালে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো ২৮,০০০ (আটাশ হাজার) বাঙালী সেটেলারকে বিনামূল্যে রেশন বরাদ্দের প্রস্তাব সরকারের নিকট দিয়েছিলেন। তা অনুমোদিত হয়নি। উক্ত দাবীকে জোরালো করবার উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে এমপি ওয়াদুদ ভূঁইয়াসহ চার সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির একটি দল বিশেষত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বাঙালী সেটেলারদের বিভিন্ন গুচ্ছগ্রাম সফর করে। উক্ত দল রেশন বরাদ্দের অনুকূলে সুপারিশ জ্ঞাপন করে। শুধু তাই নয় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষতঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সেটেলার অনুপ্রবেশ ও পাহাড়ীদের জায়গা-জমি জবরদখল জোরদার হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার লক্ষ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বাঙালী সেটেলার পুনর্বাসন দেওয়ার এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানার্থে আরো অধিক পরিমাণ ক্যাম্প বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উনিশশো সত্তর দশক হতে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্ব পর্যন্ত সরকার সামরিক রণনীতিগত প্রয়োজনে সর্বোচ্চ সংখ্যক পাঁচ শতাধিক ক্যাম্প স্থাপন করে। এগুলোর পেছনে গড়ে মাসিক ৪৫ কোটি টাকা খরচ হয়। চুক্তি উত্তরকালে অল্পসংখ্যক ক্যাম্প তুলে নেওয়া হলেও পরবর্তীতে আরো নূতন ক্যাম্প বাড়ানো হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়।

আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিকারী বাঙালী সেটেলারদের মধ্যে ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার) পরিবারকে প্রতিবছর ৩৮,০০০ (আটত্রিশ হাজার) মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিনামূল্যে দিতে হয়। তদুপরি বাড়ীঘর নির্মাণ ও অন্যন্য খাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। বিগত ১৯৭৯ সাল হতে এ ধরনের রেশন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। আমাদের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে এ ধরনের অনুৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যয় নি:সন্দেহে অহেতুক ও অপব্যয় বলা যায়। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে ১৯৭৯ সাল হতে বর্তমানে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ (সাতাশ) বছরের রেশন ও অন্যান্য খাতে ব্যয়িত অর্থ দিয়ে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে যে কোন পেশায় সেটেলার পরিবারদের অনায়াসে পুনর্বাসিত করা যেতো এবং এখনো করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সরকার যদি মনে করে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসী পাহাড়ীদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে মুষ্ঠিমেয় সম্পদ লুণ্ঠনকারী ব্যক্তির সম্পদ লুণ্ঠন প্রক্রিয়া স্থায়ী ও নিরাপদ করা আবশ্যক তাহলে উক্ত সুপারিশ অনুমোদিত ও কার্যকর হতে পারে। অন্যথায় তা হতে পারে না। স্মর্তব্য মুষ্ঠিমেয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির হীনস্বার্থ পরিপূরণের মাধ্যমে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ীদের নয় সারাদেশের জনসাধারণের কারোরই তাতে কোন লাভ হবে না।♦

জুম্মদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির নীল নক্সা

ধীর কুমার চাকমা

এক. ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির আগে এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ছিল। কিন্তু আজকের মতো মৌলবাদী আগ্রাসন ছিল না। ছিল না সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের ভূমি জবরদখল ও নারী ধর্ষণ। কালের বিবর্তনে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভক্তি ও পাক-ভারত উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়েছে। কিন্তু তার পরবর্তী সময়েও জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। বিভিন্ন সময়ে তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। যেমন-

- প্রথমতঃ পাকিস্তান শাসনামলের শুরুতেই ১৯৪৮ সালে চিটাগয় হিল ট্র্যাক্টস ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন বাতিল করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বিহার থেকে আগত মুসলমান পরিবার বসতি প্রদান করা;
- ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথমে শাসন বহির্ভূত এলাকা ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার মর্যাদা বাতিল করা;
- দ্বিতীয়তঃ শিল্পোন্নয়নের নামে ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৪,০০০ (চুয়ান্ন হাজার) একর চাষযোগ্য জমি জলমগ্ন করা এবং লক্ষাধিক জুম্ম ও স্থায়ী বাসিন্দাকে নিজ ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করা;
- তৃতীয়তঃ সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্ত্বাসমূহকে সাবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান না করা;
- চতুর্থতঃ ১৯৭৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের জায়গা অধিগ্রহণ করে দীঘিনালা, রুমা ও আলকিদম সেনানিবাস স্থাপন করা;
- পঞ্চমতঃ ১৯৭৯ সালে জিয়া সরকারের আমলে সমতল এলাকা হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বাঙালী এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা এবং
- ষষ্ঠতঃ সর্বোপরি ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেও চুক্তি বাস্তবায়নে ষড়যন্ত্র করা ইত্যাদি।

১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু সদ্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নুতন সরকারের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণ নীতি অপরিবর্তিত থেকে যায়। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সরকারের অভ্যন্তরে একটি স্বার্থান্বেষী মহল ধারাবাহিকভাবে এই নীতি বাস্তবায়নে সদা তৎপর। এই মহলটি সরকারী এবং বিরোধী উভয় দলে থাকে। তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি'র মধ্যেও এই মহলের শক্তিশালী হাত প্রসারিত। তা না হলে ২০০৩ সালে ২৬শে আগষ্ট মহালছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হওয়ার পর এক পর্যায়ে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক,"পাহাড়ীরা অসহায়, আমি নিরুপায়"--এই উক্তি করতে বাধ্য হলেন কেন? বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণ নীতি বাস্তবায়নের অংশ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অস্থিতিশীলতা। এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে পুঁজি করে সেনাবাহিনীর মদতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল ও নারী ধর্ষণসহ নানাভাবে এখানে অহরহ মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

২. গত ১০ এপ্রিল ২০০৬ সোমবার রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলায় বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইহাট ও মারিস্যার চৌমুহনীতে (দুই টিলায়) ১০নং নামক জায়গায় অবস্থিত আর্মি ক্যাম্পের সুবেদার কোবাদ আলী যাত্রীবাহী বাস থামিয়ে বাস থেকে এক জুম্ম বিধবা মহিলাকে উঠিয়ে নিয়ে ক্যাম্প এলাকায় দিনদুপুরে ধর্ষণ করে। এ যেন পশুরাজ সিংহের মেষ শাবক শিকার। ধর্ষণের ঘন্টাখানেক পর দীঘিনালাগামী আরেক কোষ্টারে তুলে দেয়। স্বাধীন দেশেও আজ জুম্ম জনগণ উগ্র ধর্মান্ধ ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ ও সেনা শাসনের যাতাকলে নিস্পেষিত। ইতিমধ্যে চুক্তির মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির অনেক সদস্যকে নিজ বাড়ী থেকে ধরে এনে সেনাবাহিনী মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। তাদের অনেকের এখনও জামিন লাভ হয়নি এবং জেলখানায় মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

এমনিতে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি। উপরন্তু পরনির্ভরশীল অর্থনীতি আর আমলা পুঁজির দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। সরকারী চাকুরেদের বেতন-ভাটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কৃত্রিম সংকটের কারণে সাধারণ মানুষের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। তাই বাজারে খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য থাকলেও ক্রয়ক্ষমতা না থাকার কারণে মানুষ অতীব কষ্টে জীবন কাটায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন বলতে কেবলমাত্র যেখানে সেটেলার বাঙালীর গ্রাম ও বাজার এলাকা রয়েছে ঠিক ততটুক মাত্র রাস্তাঘাট আর মাদ্রাসা নির্মাণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে সেটলার অধ্যুষিত এলাকায় গড়ে উঠেছে "ওযাদুদ পল্লী " ইত্যাদি নামীয় ফলজ ও বনজ বাগান প্রকল্প।

৩. খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ির যেখানে সেটলাররা অবৈধ বসতি গেড়েছে সেখানে রাতারাতি হয়েছে একটি ওয়াদুদ উচ্চ বিদ্যালয়। আগে এই স্কুলের জায়গা ছিল আদিবাসীদের। সেখানে পূর্বে "বৌদ্ধ শিশুঘর" নামে একটি শিশুসদন স্কুল ছিল। এই শিশুসদন জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে তদস্থলে ওয়াদুদ উচ্চ বিদ্যালয় নির্মিত হয়। তারই পাশে চালু আছে ব্রিটিশ আমলের মাইসছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ে ষাট দশকে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা শিক্ষকতা করেছিলেন। সেই বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ছিল সবচেয়ে জরুরী। আর সদ্য নির্মিত ওয়াদুদ উচ্চ বিদ্যালয় এর জায়গায় কোন স্কুল না করলেও চলে। যেহেতু মাইসছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় আর সদ্য নির্মিত ওয়াদুদ উচ্চ বিদ্যালয় হচ্ছে রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়িগামী রাস্তার এপাশ-ওপাশ।

অনুরূপ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায় বেতছড়ি নামক স্থানে "রসিক নাগর মেম্বার পাড়া" নামে এককালে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গ্রাম ছিল। বর্তমানে এ পাড়ার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে "রশিদ নগর পাড়া"। রসিক নাগর চাকমা হচ্ছেন ১৯৫৯ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আয়ুব খান প্রণীত বুনিয়াদি গণতন্ত্রের (বেসিক ডেমোক্র্যাসী) যুগে প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত ইউপি মেম্বার এবং বর্তমানে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামটি জেলা শাখার সভাপতি শ্রী গুণেন্দু বিকাশ চাকমার পিতা। রসিক নাগর মেম্বার ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী হলেও নিজ গ্রামে ফেরৎ যেতে পারেননি। তাঁর পাড়ার সংলগ্ন এলাকায় ছিল "বোয়ালখালী বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম"। এখন তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে "বোয়ালখালী অনাথ আশ্রম"। আর স্কুলেও "বোয়ালখালী অনাথ আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়" নামে সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। এখন স্কুলের চারিদিক জুড়ে গড়ে উঠেছে সেটেলারদের সুরম্য গৃহ ও অবকাঠামো।

এখন বহিরাগত পর্যটকদের জিজ্ঞাসা, সেটলাররা যুগযুগ ধরে এখানেই ছিল বুঝি (?)। পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকার আগে তারা মনে করতো সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এখনও গভীর জঙ্গলে ঠাসা। মাচাং ঘরে আদিবাসীদের ছাড়া এখানে আর অন্য কাউকে দেখা যাবে না। এ অনুপ্রবেশ দেখে তারা আশ্চর্য বনে যান। ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীরা এখনো ট্রান্সজিট ক্যাম্প দীঘিনালায় (খাগড়াছড়ি) আবাসিক স্কুলে শরণার্থীর জীবন কাটাচ্ছে। অপর পক্ষে তাদের এলাকাকে রবার বাগান প্রকল্প এলাকায় ঢুকানো হয়েছে। মূল ভুমির মালিক যারা তাদেরকে রাবার বাগান শ্রমিকে পরিণত করা হয়েছে। ভূয়া কবুলিয়ত দেখিয়ে জুম্মদের জায়গা জেলা প্রশাসনের সহায়তায় সেটেলারদের নামে বন্দোবস্তির ষড়যন্ত্র চলছে। ফলে ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা নারী ধর্ষণ ও জোরপূর্বক জুম্ম নারী বিবাহ সেখানে নিত্য নৈমিতিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ও প্রশাসন স্বীকার করতে নারাজ। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের সবকিছু হারিয়ে যাবে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের আগ্রাসনে।

৪. খাগড়াছড়িতে রাত ১টা/২টায় সেটেলার ভরতি রিজার্ভ বাস আসে প্রায় প্রতি রাতে। সূর্যোদয়ের আগে তাদের বিভিন্ন সেটেলার গ্রামে পৌছানো হয়ে থাকে সরকারী অর্থায়নে পূর্বাহ্নে নির্মিত ঘরে। আগে আসতো ছিটেফোটাভাবে যাত্রীবাহী বাসে করে। তখন দেখা যেতো চেঙ্গী ব্রিজ পার হবার পর খাগড়াছড়ি বাস টার্মিনালে পৌছার আগে রাস্তার দু-ধারে পলিটিনের তাঁবুর ভিতর নুতন কয়েকটা পরিবার। কোন সময় দেখা যাবে ঐ তাঁবু খালি পড়ে রয়েছে। হয়তো আবার পর দিন সকালে অচেনা পরিবারে ভরতি। সেটা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হবার পর রাতে গাড়ীতে করে পশু-পক্ষীরও অজান্তে এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে।

সম্প্রতি পত্রিকায় দেখা গেছে যে, খাগড়াছড়িতে এবারে নূতন ভোটার তালিকায় ভোটারের সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে গেছে। সরেজমিনে তদন্ত করলে দেখা যাবে, কোন কোন ভোটার হয়তো এখনো পর্যন্ত বরিশালে নয়তো বা রংপুরের বাসিন্দা হিসেবে নিজ জায়গায় বসবাসরত। প্রতি পৌরসভা নির্বাচন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হাওয়া ভোটারের জন্য খাগড়াছড়ি সদরের হোটেল ও রেষ্টুরেন্টে জায়গা হয়না। যেহেতু ভূয়া ভোটার তালিকা বহিরাগত বা অতিথিদের দিয়েই প্রস্তুত করা হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আসার আগে খাগড়াছড়ি থেকে আগাম প্রেরিত কবুলিয়ত পকেটে করে সেটেলাররা পার্বত্য চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে গাড়ীতে উঠে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে না ঢুকতেই সেটলাররা জায়গার মালিক বনে যায়। অপরদিকে প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে কিংবা অর্থাভাবে জুম্মরা নিজ ভোগদখলীয় পৈত্রিক ভিটামাটি নিজ নামে বন্দোবস্তী প্রক্রিয়া চালিয়েও সফল হয়নি অথবা বাবার নামীয় সম্পত্তি নিজের নামে নামজারি করতে পারেনি। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান- এই তিন পার্বত্য জেলায় এই চিত্র একই রকম। ১৯৯২ সালে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কে বা কারা অগ্নি সংযোগ করলে জায়গা-জমি সংক্রান্ত অনেক রেকর্ডপত্র ধ্বংস করা হয়েছে। এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ও সাপ্রদায়িক সম্প্রীতি তাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য পরিপূরণের অন্তরায়। তাই ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পরও অনেক সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সংঘটিত হয়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী হচ্ছে নিম্নরূপ–

- ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে রাঙ্গামটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নস্থ বাঘাইহাটে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয় এবং প্রায় অর্ধ-শতাধিক আহতকে দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি ও চমেক হাসপাতালে নেয়া হয়।

- ১৯৯৯ সালের ১৬ অক্টোবর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় দীঘিনালা উপজেলাধীন বাবুছড়া বাজারে সেনাবাহিনী ও সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের উপর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলা শতাধিক জুম্ম আহত হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই চিরদিনের মতো পঙ্গুত্ব বরণ করেছে।
- ২০০১ সালে ১৮ মে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলায় মধ্য বোয়ালখালীতে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের গ্রামে সেনাবাহনী ও পুলিশের উপস্থিতিতে সেটেলাররা লুঠপাটের পর অগ্নিসংযোগ করে।
- ২০০১ সালে ২৫ জুন রামগড় সদরে বিডিআর ও পুলিশের উপস্থিতিতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের গ্রামে অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করা হয়।
- ২০০৩ সালের ১৯ এপ্রিল খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ২৬৪নং ভূয়াছড়ি মৌজার আদিবাসীদের বসতভিটার উপর সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের ভূমি অবৈধ দখল, গৃহ নির্মাণ ও সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়।
- ২০০৩ সালের ২৬ আগষ্ট খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলায় ৫টি মৌজার ১৪টি জুম্ম গ্রামের সাড়ে তিন শতাধিক ঘর-বাড়ী সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে সেটেলার বাঙালীরা সম্পূর্ণরূপে লুঠপাট করার পর অগ্নিসংযোগ করেছে। খুন করেছে ২ জন। ধর্ষণ করেছে ১০ জন জুম্ম নারীকে।
- গত ২৯ জানুয়ারী থেকে ৩১ মার্চ ২০০৬-এর মধ্যে নুনছড়ি গুচ্ছগ্রামের বাঙালী সেটেলাররা সদ্য বসতিকারী সেটেলার বাঙালীদের সাথে নিয়ে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গামারীঢালা এলাকার জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় ভূমিতে প্রায় ১৫০টি ঘরবাড়ী নির্মাণ করে।
- ২০০৬ সালে ৩ এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলাধীন মাইসছড়িতে সেটেলার বাঙালীদের সাম্প্রদায়িক হামলায় ২ জন জুম্ম কিশোরী ধর্ষিত ও কমপক্ষে ৫০ জন আহত, তম্মধ্যে ১১ জনকে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

৬. সার্বিক পরিস্থিতির নিরিখে একথা স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন হলে ঐসব সাম্প্রদায়িক হামলা ঘটতে পারতো না। শাসকগোষ্ঠীর ঐ স্বার্থান্বেষী মহল পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তির পূর্বাবস্থা বজায় রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি যাতে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে সেজন্য যথাক্রমে অপারেশন দাবানল, অপারেশন উত্তরণ জারী রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসন অব্যাহত রাখা হয়েছে। মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলাদের পুনর্বাসন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম ও স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ধ্বংস সাধনই পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসনের মূল লক্ষ্য। কারণ-

১) জুম্মদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে পারলে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি সংসদীয় আসন দখল করা সহজতর হবে।
২) ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নবোর্ড এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ অনায়াসে দখল করতে পারলে জুম্মরা কোণঠাসা হবে।
৩) সকল সংস্থার চেয়ারম্যান, মেম্বার পদে তাদের নিজস্ব লোক নির্বাচিত করাতে পারলে সরকারী প্রশাসন তাদের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য হবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মিথ্যা মামলা, নারী ধর্ষণ, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ, উদ্বাস্তুকরণ, হত্যা ও গুম ইত্যাদি দ্বারা যখন জুম্মদের ধ্বংস করা যাচ্ছিল না ঠিক তখনিই পার্বত্য চট্টগ্রামের অহিতকামীরা জটিল নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে অবৈধ উপায়ে নির্বাচনে জয়যুক্ত হবার সকল প্রকার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন হলে তাদের লক্ষ্য হাসিল হবে না। তাই চুক্তি বাতিলের অংশ হিসেবে সমঅধিকার আন্দোলন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঙ্গালী ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে তুলেছে। এসব সংগঠনই পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৭. অতি সম্প্রতি গত ০৩/০৪/০৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি এলাকায় চাউফ্রু কার্বারী পাড়ায় ভূয়া কবুলিয়তের জোরে সেটেলাররা জুম্ম আদিবাসীদের (মারমাদের) জায়গা জমি দখল করার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। তখন ১০/১২ জন জুম্ম আহত এবং ২ জন জুম্ম কিশোরী ধর্ষিত হয়। তাদেরকে খাগড়াছড়ি সদর সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহতদের একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। আহতরা এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক জীবনযাপনের পরিবেশ ফিরে পায়নি। অপরদিকে নিরাপত্তার কারণে ধর্ষিত মহিলারাও যার যার ঘরে ফেরৎ যেতে পারেনি। এই রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে পড়লে সরকারীভাবে সংসদীয় কমিটি ও অনেক পত্রিকার সাংবাদিক সত্য উদ্ঘাটন করার জন্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সত্য ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশ হলে পর স্বার্থাণেন্বষী মহল অর্থাৎ যারা এই ঘটনার সত্যটাকে মেনে নিতে পারেনি তারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করানোর জন্য এবং বিশ্ব বিবেককে বিভ্রান্ত করার জন্য তাদেরই অর্থায়নে তাদের পক্ষ সমর্থনকারী সাংবাদিক ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় ও মূল ঘটনার উল্টো বিবৃতি দেয়। অর্থাৎ "নিজেদের কাঁঠাল গাছ থেকে সেটেলার মহিলারা কাঁঠাল পাড়তে এসে জুম্ম মহিলাদের বাঁধার মুখে ঘটনার শুরু বলে স্বার্থান্বেষী মহল তাদের পক্ষে পত্রিকায় বিবৃতি দেয়। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বর্তমানে ঐ জায়গা সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেটেলারদের অবৈধ দখলে রয়েছে। হয় সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণ নতুবা সেটলারদের নামে বন্দোবস্তীর অজুহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী ও স্থায়ী বাসিন্দাদের ভূমি এভাবেই অহরহ জবরদখল হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের কাছে ধর্ণা দিলেও তার কোন সুরাহা হয়নি। ♦

পার্বত্য চট্টগ্রামে 'আদিবাসী' প্রশ্নে

তনয় দেওয়ান

পার্বত্য চট্টগ্রামে কারা 'আদিবাসী' বা 'আদি বাসিন্দা' তা নিয়ে আবার বিতর্কের অবতারণা করেছেন খাগড়াছড়ি জেলার জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবির। তিনি সম্প্রতি একটি বই বের করে তাতে বাঙালীদের আদি বাসিন্দা এবং চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। যদিও তার দাবীর স্বপক্ষে কোন দলিল বা প্রমাণ হাজির করতে পারেননি। কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িকতা আর উপনিবেশিক মানসিকতায় দুষ্ট হয়ে তিনি এই গর্হিত কাজটি করেছেন। তারও আগে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহারে বিরত থাকার জন্য বলেছে। প্রশ্ন হলো এসব কিসের আলামত? এই 'আদিবাসী' শব্দটি নিয়ে কেন তাদের এত মাথাব্যাথা?

'আদিবাসী' শব্দটি হলো ইংরেজী Indigenous শব্দটির আভিধানিক অর্থ। যাকে বলা যায় স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত। মূলত: জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে আদিবাসী বর্ষ ঘোষণা করলে এই শব্দটি বিশ্বব্যাপী আলোচনার ঝড় তুলে। এছাড়া ৯ আগষ্টকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে জাতিসংঘ। পরে জাতিসংঘের উদ্যোগে পালিত হয় আদিবাসী দশক। এই দশকের ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘে আদিবাসীদের জন্য গঠিত হয় স্থায়ী ফোরাম। এই ফোরামের সুপারিশক্রমে আবারও আদিবাসী দশক পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও আদিবাসী দিবস, দশক ও বর্ষ পালিত হচ্ছে। তবে সরকারীভাবে নয়। ২৫ লক্ষাধিক জনসংখ্যার ৪৫টির অধিক জনগোষ্ঠী নিজেদের আদিবাসী দাবী করে এই দিবসটি পালন করছে। তাদের এই দিবস, বর্ষ ও দশক পালনের মধ্যে দিয়ে তারা ঘোষণা করছে নিজেদের জাতিগত অস্তিত্বকে, দাবী জানাচ্ছে সংবিধানে স্বীকৃতির, উর্ধে তুলে ধরতে চাচ্ছে প্রথাগত ভূমি অধিকারকে এবং একটি জাতির টিকে থাকার জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারকে। শাসকগোষ্ঠী তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে এবং নানানভাবে আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টাকে ভূলুণ্ঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

একটা অঞ্চলে কারা আদিবাসী এই বিতর্কটি নিরসনের জন্য আমাদের স্থান, কাল ও পাত্রকে বিবেচনা করতে হবে। যদি সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে কে কোথায় ছিল তা দিয়ে বিচার করি তবে 'আদিবাসী' বিতর্কটি অর্থহীন। আমরা জানি আদিবাসী বিতর্কটি এসেছে ইউরোপীয় দেশসমূহ কর্তৃক তথা উপনিবেশ স্থাপন তথা বাজার দখল করার মাধ্যমে যখন সংশ্লিষ্ট এলাকার পূর্বতন অধিবাসীদের অধিকার নস্যাৎ করা হয়েছে সেই অধিকারকে বর্তমান সময়ে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তার প্রয়াস হতে। তাহলে দেখতে পাই যে, মানব সভ্যতা বিকাশে শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপীয় দেশগুলো যখন তাদের বর্ধিত উৎপাদন বাজারজাত করণে এবং কাঁচামাল সংগ্রহে বিশ্বে চষে বেড়ান তখন উপনিবেশ স্থাপনের নীতি অবলম্বন করেন। এরপর উপনিবেশিক আমলের কথা এখানে আলোচনার অবকাশ রাখে না। তাহলে আমরা সভ্যতার বিকাশে যখন পুঁজিবাদী যুগে সভ্যতা প্রবেশ করছে এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে পৃথিবী ছোট হয়ে আসা শুরু করে তখনকার প্রেক্ষাপটে আদিবাসী শব্দটির প্রয়োগকে যৌক্তিক বলে ধরে নিতে হবে।

বাংলাদেশের গোটা দেশের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী বিতর্কে না গিয়ে আমাদের আলোচনা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী বিতর্কটি। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বর্তমানে দশ ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলি আদিবাসী তা বিতর্কের অবকাশ রাখে না। আমরা ইতিহাসের গভীরে তাকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা অস্থিত্ব ও মানচিত্র দেখতে পায়। বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিযুক্ত চীফ অব চিটাগাং মি. হেনরী ভেরোলিষ্ট ১৭৬০ সালে এক দলিলে এই রাজ্যটির সীমানা উল্লেখ করেছেন- পশ্চিমে নিযামপুর রাস্তা(বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক), দক্ষিণে সাঙ্গু নদী, পূর্বে কুকী রাজ্য (বর্তমানে ভারতের মিজোরাম) এবং উত্তরে ফেনী নদী।

এ অঞ্চলে বর্তমান সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলি যারা সম্মিলিতভাবে নিজেদের 'জুম্ম' নামে অভিহিত করে তারাই আদি অধিবাসী ছিল। আমরা দেখতে পাই যে, ১৭৭৭-৮৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এক দশকব্যাপী বৃটিশ উপনিবেশ শক্তির সাথে এ জনগোষ্ঠীগুলির সাথে যুদ্ধ সংঘাত হয়েছে। বৃটিশরা উপনিবেশ স্থাপনের সময়ে এসকল জনগোষ্ঠীর আদি অস্থিত্বকে স্বীকার করে নেয় এবং তাদের শাসনকাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকে। পরে ১৮৬০ সালে এ অঞ্চলে একটি জেলায় পরিণত করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নাম দিয়ে নিজেদের উপনিবেশভূক্ত করে নেয় বৃটিশরা। তারপরও তারা এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে এবং ১৮৮১ সালে ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন এবং ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি প্রবর্তন করেন। এরফলে এ অঞ্চলটি একটি স্বতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হয়। ১৯০০ সালের শাসনবিধিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

""No person other than a Chakma, Mough or a member of any tribe indigenous to CHT, the Lusai Hills, the Arkan Hill Tracts or the state of Tripura shall enter or reside within CHT unless he is in possession of a permit granted by the Deputy Commissioner at his discretion.''

তাহলে দেখা যায় যে, চাকমা, মগ বা মারমাদের এ অঞ্চলে বসবাসের ক্ষেত্রে অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই বরং অন্যান্যদের (বাঙালীদেরসহ) এখানে বসবাসের ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজন হবে। তাহলে প্রশ্ন জাগে যদি বাঙালীরা (জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবিরের ভাষায়) আদিবাসী হন তবে তাদের কেন বসবাসের জন্য অনুমিতর প্রয়োজন হবে?

অরও প্রশ্ন জাগে এই পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব কখন ও কিভাবে ঘটলো? বাঙালী আবির্ভাব এই অঞ্চলে বেশী দিনের নয়। চাকমা রাজা এ অঞ্চলে সমতল জায়গাগুলোতে লাঙল চাষ প্রবর্তনের জন্য কিছুসংখ্যক বাঙালী পরিবারকে এখানে নিয়ে আসেন কৃষক প্রজা হিসেবে। পরে তারা বংশ পরম্পরায় এখানে বসবাসের অনুমতি নিয়ে বাস করতে থাকেন। কালক্রমে তারা চিহ্নিত হন 'পুরোন বসতি বাঙালী' হিসেবে। পাকিস্তানী উপনিবেশিক আমলে অনেকে এ অঞ্চলে সরকারী বদান্যতায় ভাগ্য বদলানোর জন্য এসে থাকলেও তারা স্থান করে নেন স্বাভাবিকভাবে। আমরা জানি ভারত বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী জনগোষ্ঠী ছিল মাত্র ১.৫%। আর বাদবাকী ৯৮.৫% ছিল চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী। কাজেই সহজেই অনুমিত হয় কারা এ অঞ্চলের আদিবাসী।

আবার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও আমরা যেতে পারি আদিবাসী শব্দটি নিয়ে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ১৯৮৯ সালের কনভেনশনে আদিবাসী বলতে বুঝিয়েছে-

""Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their social, economic, cultural and population institutions.''

এছাড়া UN Reporter for the study on the problem of discrimination against indigenous peoples (1984) Mr. Martinez Cobo এর মতে-

''Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct form the other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems. In short, Indigenous peoples are the descendants of the original inhabitants of a territory overcome by conquest or settlement by aliens.''

উল্লেখিত তাত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হতে বুঝা যায় যে, জুম্মরাই এ অঞ্চলের আদিবাসী আর বাঙালীরা হলেন ভিন অঞ্চল থেকে আগত সোজা কথায় বহিরাগত বা এলিয়েন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম বাঙালী বা শাসকগোষ্ঠীর ভাষায় উপজাতি-অউপজাতি আচরণটি সাম্প্রদায়িক, উগ্র ধর্মান্ধ ও উপনিবেশিক মানসিকতার কারণে বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। ইতিহাসের পৃষ্টায় তাকালে দেখতে পায় যে, দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে ভারত পাকিস্তান ভাগ হলে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অর্ন্তভূক্ত হয়। যা ছিল ইতিহাসের চরম ভূল সিদ্ধান্ত। ফলে উপনিবেশিক পাকিস্তানী ইসলামী শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামী করণের নীতি অবলম্বন করে। মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশে উৎসাহিত করতে থাকে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে পরিবর্তন আনে। পরে ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে শেখ মুজিবুর রহমান জুম্মদেরকে বাঙালী জাতিতে প্রমোশন দেন। এটা ছিল ইসলামী সম্প্রসারণবাদের সাথে উগ্র বাঙালী জাতয়িতাবাদ যুক্ত হওয়া। পরে গোটা দেশে সামরিক শাসন জারী হলে তার সাথে যুক্ত হয় সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৭৯ সাল হতে শুরু হয় সরকারী উদ্যোগে বাঙালী মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপন প্রক্রিয়া। তারা মেতে উঠে গণহত্যায়, ভূমি বেদখলে ও সন্ত্রাসে। ফলে জুম্ম বাঙালী সম্পর্কে প্রচন্ড রকমের ছিঁড় ধরে এবং তা জাতিগত সহিংসতায় পর্যবসিত হয়।

আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীর সংখ্যা প্রায় ৪৫%। প্রশ্ন জাগে এতসব বাঙালী কোথা হতে এলো এবং জুম্মরাই বা কোথায় গেলো? তার উত্তরে বলতে হয় যে, বাঙালীদের বৃদ্ধিটা ছিল যান্ত্রিক এবং তা হাজার হাজার পরিবারকে পুনর্বাসনের মাধ্যমে। আর জুম্মদের হ্রাস পাওয়াটা ছিল একটা ট্রাজেডী। তারা ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে দেশ ছাড়া হয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন দেশ হতে বিতাড়িত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে গণহত্যার শিকার হয়ে শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে। ফলে

জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি না ঘটে তারা হ্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তার সাথে রয়েছে ম্যালেরিয়ার মতো প্রাণসংহারি রোগ ও বিরূপ প্রকৃতি।

১৯৪৭ হতে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শাসনামলকে বাঙালীদের মতো জুম্মদের কাছেও উপনিবেশিক শাসনামল বলে পরিচিত। জুম্মরা তাই স্বাভাবিকভাবে চেয়েছিল স্বাধীন দেশে সবাই উপনিবেশিক শোষণ-বঞ্চনা হতে মুক্ত হবে। কিন্তু ১৯৭১ হতে ১৯৯৭ কাল পর্বটিও জুম্মদের কাছে একটি উপনিবেশিক ও সাম্প্রদায়িক কালপর্ব হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কেননা বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর গৃহীত নীতি পাকিস্তানী উপনিবেশিক আমলেরই উত্তরাধিকার। বিশেষ করে জনসংখ্যাগত ভারসাম্য পরিবর্তনের জন্য তথা নতুন বসতি স্থাপন করে প্রথম শ্রেণীর ভূমি বেদখল করাটা ছিল চরম ঘৃণ্য। এই প্রক্রিয়ায় চলে আসা বাঙালীরা 'সেটেলার বাঙালী' বলে সমধিক পরিচিত। সংক্ষেপে সেটেলার বলা হয়। এই সেটেলার শব্দটা পার্বত্য চট্টগ্রামে এতই ঘৃণিত যে, পুরোনবসতি বাঙালীরাও 'গালি' অর্থে এই সেটেলার শব্দটি প্রয়োগ করেন। তাই ১৯৯৭ সালে একটি সফল চুক্তির মাধ্যমে আশা জেগেছিল স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষের মতো নি:শ্বাস নেওয়ার ক্ষেত্রটি এতদিন পর উন্মুক্ত হলো। কিন্তু এটা চরম পরিহাস যে, জুম্মরা এখনো তার কোন দিক খুঁজে পায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হওয়ার পর জেলা প্রশাসকের মতো একজন ব্যক্তি যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি বলতে পারেন যে, জুম্মরা আদিবাসী নন বরং বহিরাগত তাতে আতংকিত না হয়ে পারা যায় না।

আমরা আরও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছি না যে, শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠী, আমলা ও সেনাবাহিনী এই অপপ্রচারণা ও অস্বীকৃতির সাথে জড়িত নয় কতিপয় বুদ্ধিজীবীও তাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়েছে। প্রায়ই দেখা যায় যে, এসকল তথাকথিত সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অস্তিত্বের গভীরে প্রবেশ না করে ভাসাভাসে বক্তব্য দেন, লেখা লিখেন এবং সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দেন। বিশেষ করে জামায়াত ও বিএনপি ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের জ্ঞানপাপীতে পরিণত হয়ে এসকল পাপাচারে লিপ্ত হন। সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে চড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সৌন্দর্য অবলোকন করে সেনাবাহিনীর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটান। আদিবাসী জুম্মদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় লিখেন। তাদের ভাষায় আদিবাসী জুম্মরা সার্টিফিকেট পান 'উপজাতি' হিসেবে। এখন প্রশ্ন হলো উপজাতি বলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং বহিরাগত বলে আদিবাসীদের অস্তিত্বকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার শাসকগোষ্ঠীর এই হীন তৎপরতা কিসের বার্তা বহন করে?

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করে তিন পার্বত্য জেলায় যেভাবে ভূমি বেদখল, সামরিকবাহিনীর সন্ত্রাস, গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, সেটেলার বাঙালীদের নতুন করে পুনর্বাসন চলছে তার অর্থ হলো শাসকগোষ্ঠী কখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা চেয়েছে জুম্মদের নিরস্ত্র করে তিলে তিলে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে। যে কারণে চুক্তির মূল স্পিরিট শান্তি ও উন্নয়নে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ আমরা শাসকগোষ্ঠীর কাছ হতে দেখতে পাচ্ছি না। আদিবাসীদের উন্নয়নে যে স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠন করা হয়েছে তা দলীয় স্বার্থে এবং সংকীর্ণতাবোধ দ্বারা পরিচালিত করা হচ্ছে। আদিবাসীদের উপযোগী শাসন কাঠামো গড়ে তুলতে বাধার সৃষ্টি করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে কব্জার মধ্যে রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে অকার্যকর রাখা হয়েছে। জেলা পরিষদগুলো দলীয় কার্যালয়ে পরিণত করা হয়েছে। ফলে গণপ্রতিনিধিত্বশীল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে না তুলে শাসকগোষ্ঠী সামরিক শাসনকে বহাল রেখেছে। 'অপারেশন উত্তরণ' নামে জারী করা এই সামরিক শাসন পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতন্ত্রের পথে, আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের পথে জগদ্দল পাথরের মতো বসে আছে। এই সামরিক বাহিনী বাঙালী জুম্ম সম্পর্কে সবসময় বিরূপ বা প্রতিকুল সম্পর্ক জিইয়ে রেখেছে। তারা সেটেলার বাঙালীদের ভূমি বেদখল করতে প্ররোচিত করছে। গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করে জাতিগত সহিংসতা ছড়াচ্ছে।

আদিবাসীদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে শাসকগোষ্ঠী কোন বিকল্প সমাধানের পথ বা সামরিক বাহিনী দ্বারা আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করার পথ হতে সরে আসা জরুরী। কেননা, সামরিক কোন সমাধানই পার্বত্য চট্টগ্রামে জয়ী হতে পারেনি। গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য অধিকারের জন্য আদিবাসী যুবকরা তাদের অস্ত্র ত্যাগ করেছে। বিচ্ছিন্নতার দিকে না ঝুঁকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সম্পৃক্ততার দিকে মত দিয়েছে। এখন এ অঞ্চলে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য আইনানুগ স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণীত করা জরুরী। যা দিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন, জেলা পরিষদ নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান সময়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে যে সংস্কার সংগ্রাম চলছে তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সমস্যার নিরসনে সংশ্লিষ্টদের সজাগ থাকতে হবে।

আমরা আশা করবো বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রকে সুসংহত করার পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হবেন। খাগড়াছড়ি জেলার সাম্প্রদায়িক জেলা প্রশাসকদের মতো আমলাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অপরাধে। সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে নিয়ে যাবেন আদিবাসী ও বাঙালীদের মধ্যে উইন- উইন সম্পর্ক সৃষ্টি করতে। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির পথে এগিয়ে গিয়ে সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুক্ত করবেন। ♦

মানবিকতার ছেঁড়া স্বপ্নের জামা: সমকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসংগ

হেমন্ত ত্রিপুরা

কিছুদিন আগে একটি জনপ্রিয় ইংরেজী দৈনিক "ডেইলী স্টার"-এর সাময়িকী "স্টার উইকেন্ড ম্যাগাজিন"-এর 'হিউম্যান রাইটস' কলামে জনৈক শারমীনের একটি চমৎকার লেখা পড়েছিলাম। সেখানে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি আক্ষেপ করে লেখেন It's like laming a dog and then saying, "see it can not walk". পার্বত্য চট্টগ্রামের সহজ সরল আদিবাসী জুম্মদের অবস্থা যেন ঠিক তাই! স্বার্থান্বেষী-সাম্প্রদায়িক, দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান বিভিন্ন অপশক্তি এবং শাসকগোষ্ঠী মিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সহজ-সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষদের যেন ঠিক এভাবেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অপশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট করে চলেছেন! প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের মুখের দিকে তাকানো যায় না, এক একটি বিপন্ন মুখ! বিপন্নতা বুকে নিয়েই যেন তাঁদের এভাবে বেঁচে থাকা- স্বপ্নহীন!

সাম্প্রতিককালে এই বিপন্নতা-স্বপ্নহীনতা আরো বেড়েছে খাগড়াছড়ির বিজ্ঞ জেলা প্রশাসক জনাব হুমায়ূন কবীর "চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা" আদিবাসীদেরকে তথাকথিত বহিরাগত আখ্যায় আখ্যায়িত করার পর। মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়িস্থ রামেসু কার্বারী পাড়ার জনৈকা আবাইতু মারমা কয়েকদিন আগে চোখে-মুখে আতংকের ছাপ এবং আক্ষেপ নিয়ে একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে আমার কাছে অভিযোগ করেন, **"ভাগিনা কি করিব? সেটেলারগুনে আমরারে বার্মা চলি যাইত কয়, ডিসি বলে কইয়ে আমরা এই জা'গার মানু ন'অ। তারা আমরা জা'গাগুন আরো কাড়ি লইত চায়!"**-এই হল পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাস্তবতা!

রক্ষক যেখানে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ সেখানে কার কাছে প্রতিকার চাওয়ার আছে? অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকগণ, সমতলের জেলা প্রশাসকদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতাবান। ১৯০০ সালের হিল ট্র্যাকস রেগুলেশন অনুযায়ী তিনি শুধুমাত্র একজন জেলা প্রশাসক নন, একজন বিজ্ঞ **"সিভিল জজ"**ও বটে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এমন অনেক বিষয় আছে "সিভিল জজ" হিসেবে তিনি নিজেই এগুলোর আইনগত সমাধান দিতে পারেন। তিনি তা না করে পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে বিতর্কিত তথ্য-উপাত্ত ও ইতিহাস সম্বলিত বুকলেট প্রকাশ করে সিভিল জজের আসনকে কলংকিত করেছেন। ন্যায়বিচারের যে মর্মবাণী **"আমি কারো প্রতি রাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার কার্য সম্পাদন করিব"**-সেই মর্মবাণীর মূলে কুঠারাঘাত করে সমস্ত বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জেলা প্রশাসক হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটি একটি নতুন মাত্রার দীর্ঘমেয়াদি ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র!

প্রশাসনের এই ষড়যন্ত্র ও একচোখা নীতি এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভংগি পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কতটা প্রকট তা একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বর্ণনা করা যাক। প্রিয় পাঠক, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে উলেখ করার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। ২০০৬ সালের ৩রা এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবতকালে সংঘটিত অন্যান্য পরিকল্পিত হামলার মতো মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়িস্থ সাউথ্র কার্বারী পাড়ায় বহিরাগত সেটেলারদের হামলায় নারী ও শিশুসহ প্রায় ২৫-৩০ জন আহত হয় এবং দু'জন মারমা আদিবাসী তরুণী গণ-ধর্ষণের নির্মম শিকারে পরিণত হয়। হাসপাতালে সেদিন কি বিভৎস অবস্থা! কারোর মাথায় দায়ের কোপের দাগ, কারোর পায়ে, হাতে কিংবা পিঠে বিভিন্ন জখমের চিহ্ন। অন্যান্য আহতদের সাথে সেদিন এই দু'জন তরুণীও হাসপাতালে এসে ভর্তি হয়। ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয় বিভিন্ন মহলের অপ-তৎপরতা ডাক্তাররা পরীক্ষা করতে চান না। মামলা করতে হবে, থানা থেকে পরীক্ষার জন্য লিখিত নির্দেশ আসতে হবে এই-সেই নানা রকমের টালবাহানা। এরপর আমাদেরকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩-এর ৩২ ধারা ফটোকপি করে ডাক্তারদের সরবরাহ করতে হল। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে হারে ধর্ষণ বাড়ছে আরো সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ডাক্তারী পরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত উলেখিত ধারাটি এখানে সংযোজন করা সমীচিন বলে মনে করছি। ধারাটি নিম্নরূপ:

"ধারা ৩২ঃ অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিকেল পরীক্ষা।- (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিকেল পরীক্ষা সরকারী হাসপাতালে কিংবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন বেসরকারী হাসপাতালে সম্পন্ন করা যাইবে।

(২) উপধারা (১)-এ উলেখিত কোন হাসপাতালে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের শিকার ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য উপস্থিত করা হইলে, উক্ত হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাহার মেডিকেল পরীক্ষা অতি দ্রুত সম্পন্ন করিবে এবং উক্ত মেডিকেল পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি সার্টিফিকেট সংশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিবে এবং এইরূপ অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি স্থানীয় থানাকে অবহিত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে কোন মেডিকেল পরীক্ষা সম্পন্ন না করার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখা সম্বলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, মেডিকেল পরীক্ষার আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রাইব্যুনাল বা সংশিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্বান্তে উপনীত হন যে, যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে মেডিকেল পরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশিষ্ট চিকিৎসকই দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা ও অসদাচরণ তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, এবং সংশিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারিবে :"

উক্ত আইন সরবরাহ করার পর আবার দৌঁড়াও সিভিল সার্জনের কাছে। তখন সন্ধ্যা ৭টা।

ইলেকট্রিসিটি হঠাৎ করে চলে গেছে। পুরো খাগড়াছড়ি শহরকে মনে হচ্ছিল "ব্যাকআউট"-এর শহর। দৌড়ে গেলাম সিভিল সার্জনের কালেক্টরিয়েটস্থ বাসায়। তখন তিনি আর দরজা খোলেন না, ফোন করলে বাসা থেকে বলে দেয়া হয় তিনি বাসায় নেই। নানা প্রতিকুলতা পেরিয়ে পরের দিন সিভিল সার্জন, আরএমও, দু'জন ডাক্তার এবং একজন সিনিয়র নার্সকে নিয়ে "মেডিকেল বোর্ড" গঠন করা হয়। ততক্ষণে ৪৮ ঘন্টা পার হয়ে গেছে। এরপর ৫ই এপ্রিল বিকেল প্রায় ২:৩০ মিনিটের দিকে ভিকটিমদ্বয়কে পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষাগারে ঢুকানো হল। তারপর আবার শুরু হয় বিভিন্ন সংস্থার তৎপরতা মনে হয় যেন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা সম্পন্ন হল।

এরপর রিপোর্টের কপি পাওয়ার জন্য ডাক্তারদের প্রতি তাদের কি রকমের চাপ! অথচ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩-এ রিপোর্টের কপি শুধুমাত্র ভিকটিম অথবা তার অভিভাবকদের দেওয়ার বিধান রয়েছে। এরপর উপর মহল, বিশেষ বাহিনী, ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের টেলিফোন আর চাপের কথা আর নাইবা বললাম! কিন্তু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মেয়ে দু'টিতো যে কারোর মেয়ে অথবা বোন হতে পারত? সবারইতো মা-বোন আছে। দুটি তরুণী ধর্ষণের শিকার হয়েছে, দেশে প্রচলিত আইন রয়েছে। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তরা শাস্তি পাবে নতুবা খালাস পাবে। এটাইতো প্রচলিত আইনের বিধি-বিধান। অথচ ধর্ষণের শিকাররা পাহাড়ী আর ধর্ষকরা বাঙালি বলে অভিযুক্তদের রক্ষা করার জন্য যে প্রশাসনিক উম্মাদনা তা আমাদেরকে সত্যিই নতুন করে ভাবতে শেখায় তবে কি এই দেশ, এই প্রশাসন আমাদের নয়?

এইসব কারণেই পার্বত্য আদিবাসী মানুষের জীবনে দূর্দশার অন্ত নেই। একদিন যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল আদিবাসী জুম্মদের স্বপ্নের সুখের ঠিকানা, সেখানে আজ অশান্তির আগুন। হারিয়ে যাচ্ছে এক একটি প্রিয় কামি বা আদাম (গ্রাম), স্বপ্নের শৈশব-কৈশোর, রাধামন-ধনপুদি, লংবাই আকা কিংবা গড়াইয়া নাচের মত আরো অসংখ্য জীবনের অনুসংগ। আদিবাসীদেরকে ধীরে ধীরে একটি প্রান্তিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যার সবটুকু হয়ত খালি চোখে দেখা যায় না, ঠিক যেমনিভাবে দেখা যায় না আজ থেকে ৫০ বছর আগের পার্বত্য চট্টগ্রামকে। এমনি করে আজ যা আছে কাল হয়ত থাকবে না সময়ের ব্যবধানে! কেননা, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষেরা "প্রতিবেশী" পায়নি, পেয়েছে "ফ্রাংকেনস্টাইনরূপী দানব"কে যাদের কাজ হচেছ সবকিছু গিলে খাওয়া।

সুতরাং শাসকগোষ্ঠীর মানসিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক দৃষ্টিভংগির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত না হলে একপেশে চিন্ত াভাবনা ও কর্মপদ্ধতি দ্বারা জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনদিন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাই দেশের সুশীল সমাজ এবং শুভবোধসম্পন্ন মানুষ যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহায়তায় চলমান অরাজকতা বন্ধকল্পে এগিয়ে না আসে তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস একদিন অন্যরকম হতে বাধ্য এবং সেটার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী হয়তবা দায়ী থাকবে না।◆

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অষ্টম বর্ষপুর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র

২ ডিসেম্বর ২০০৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ঃ প্রেক্ষাপট, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

[পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অষ্টম বর্ষপুর্তি উপলক্ষ্যে এই বিশেষ ক্রোড়পত্রটি ২ ডিসেম্বর ২০০৫ দেশের বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় জাতীয় দৈনিক 'প্রথম আলো'য় প্রকাশিত হয়। পাঠকদের অনুরোধে জুম্ম সংবাদ বুলেটিনে এই ক্রোড়পত্রটি পুনঃমুদ্রিত হলো - তথ্য ও প্রচার বিভাগ]

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা পার্বত্য শান্তিচুক্তি নামে সমধিক পরিচিত। এ চুক্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের অধিকার সনদ। এ সনদ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালী স্থায়ী অধিবাসীদের দীর্ঘ বছরের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম ও কঠোর আত্মত্যাগের ফসল। এ সনদ পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ ও বিলুপ্তপ্রায় জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের ভিত্তি। এ চুক্তি দেশের সংবিধানের আওতায় ও অনুসরণে সম্পাদিত হয়েছে। এতে উপনিবেশিক শাসনামলে হৃত অধিকার গণতান্ত্রিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বিশেষত অনগ্রসর আদিবাসী পাহাড়ী বা জুম্ম জনগণ যাতে স্বীয় ভাষা-সংস্কৃতি তথা জাতীয় অধিকার সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং এ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীরা সর্বক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যমে সমতলবাসীদের সমকাতারে উপনীত হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে তার বিধান এ চুক্তিতে রাখা হয়েছে। এ চুক্তি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বার্থে নয়, সমগ্র দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যেই সম্পাদিত হয়েছে।

দেশে বিদেশে এ চুক্তি উচ্চসিতভাবে প্রশংসিত হয়েছে। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র, মানবতাবাদী সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ এ চুক্তির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। এ চুক্তির মাধ্যমে সারা বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্বল হয়েছে। বিশ্বের বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উজ্বল দৃষ্টান্ত সংযোজন করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে তৎকালীন সরকার কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কতিপয় আইন প্রণয়নসহ কিছু বিষয় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে এ চুক্তি বাস্তবায়নের মৌলিক ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু চুক্তির অন্যান্য মৌলিক বিষয়াবলী বাস্তবায়ন ও প্রণীত আইনসমূহ কার্যকর করা হয়নি। চুক্তি বাস্তবায়নে অগ্রগতি সাধিত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের অধিকারের ভবিষ্যৎ, বিশেষত আদিবাসী জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কেননা বর্তমান সরকারের আমলে চুক্তির বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন, দেশের গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় সংগঠনসমূহের উদ্যোগে ও সরকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সমতল জেলাগুলো থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকহারে বহিরাগত অনুপ্রবেশ ও জমি জবরদখল, তাদের ভোটার তালিকায় ব্যাপকভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ, ইসলামিক জঙ্গীদের আস্তানা স্থাপন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম সম্প্রসারণ, আদিবাসী পাহাড়ী বা জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দাদের উপর সরকারী বাহিনী ও সেটেলার বাঙালীদের অত্যাচার-নির্যাতন এবং 'অপাশেন উত্তরণ'এর মাধ্যমে সেনাশাসন অব্যাহত থাকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থানীয়ভাবে গণতান্ত্রিক বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

পটভূমি

এ চুক্তি প্রথমতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর আদিবাসী জুম্ম জনগণ ও স্থায়ী বাঙালী অধিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের অপরিহার্য বাস্তবতা এবং দ্বিতীয়তঃ এ অঞ্চলের শাসনব্যবস্থার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো আদিবাসী জাতির আবাসভূমি। ভিন্ন ভাষাভাষি এ সকল আদিবাসী জাতিসমূহ সমষ্টিগতভাবে 'জুম্ম' নামে সমধিক পরিচিত। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রথা, অভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগলিক পরিবেশ, আচার-অনুষ্ঠান, দৈহিক-মানসিক গঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যুগ যুগ ধরে তারা নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম-ভাষা ও স্বশাসন নিয়ে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে।

ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত জুম্ম জাতি বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে অধিকতর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাধীনসত্ত্বায় ও স্বকীয় শাসনব্যবস্থা নিয়ে বসবাস করতো। পরবর্তীতে এ অঞ্চলটি ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলে গেলেও প্রকৃতপক্ষে একটা সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকরা জুম্ম জনগণের স্বশাসন ব্যবস্থা তথা আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেনি। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম

অঞ্চলকে একটি জেলা হিসেবে ঘোষণার পর এই এলাকার শাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হলেও বস্তুতঃ জুম্ম জনগণের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়।

ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের এই অভিজ্ঞতা হয় যে, ব্রিটিশ প্রণীত আইন-কানুনের অধীনে সমতল তথা উন্নত এলাকা নিয়ে গঠিত জেলাসমূহের সাথে সমান তালে দুর্গম, পশ্চাদপদ ও পার্বত্য তথা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে নিয়ে গঠিত জেলাসমূহ চলতে পারছে না। সমতল তথা উন্নত অঞ্চলে প্রচলিত আইন ও বিধানগুলো পশ্চাদপদ আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য এলাকায় কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না ঐতিহ্যগত ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে। আদিবাসীরা এতই পশ্চাদপদ যে তাদেরকে সমতলের অধিবাসীদের সাথে একই ধরনের শাসনাধীনে নিয়ে আসলে তাদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে এবং উন্নততর সমতল অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক প্রতারণা এবং বঞ্চনার শিকারে পরিণত হবে। তাই তাদের জন্য এমন এক পৃথক সহজ-সরল ও আরক্ষামূলক শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন যা তাদেরকে তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রাখতে স্বাধীনতা দেবে এবং উন্নত প্রতিবেশিদের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত রাখবে।

তারই আলোকে ভারতের অন্যান্য অনেক জেলার মতো ১৮৭৪ সালের তফসিলভূক্ত জেলা আইন মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকেও তফসিল জেলা ঘোষণা করে জুম্ম জনগণের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয় - যা পরবর্তীতে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি মাধ্যমে পাকাপোক্ত করা হয়। উক্ত শাসনবিধিতে বহিরাগত কোন ব্যক্তির পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বসতিস্থাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। পরবর্তীতে ১৯১৯ সাল ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্যান্য অনেক অঞ্চলের ন্যায় 'শাসন বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়। পাকিস্তান শাসনামলেও ভারতের স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭-এ বর্ণিত আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত বিধান অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে ও ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও পৃথক শাসিত অঞ্চল বা উপজাতীয় অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়।

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নিপীড়নের ফলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) জনগণের জীবন অত্যন্ত দূর্বিসহ হয়ে উঠে। সারাদেশের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির ভিত্তিতে সমতলবাসী ও অস্থানীয় বাঙালী কর্মকর্তাদের কর্তৃত্বাধীন সরকারী প্রশাসনের অবিচার ও নিপীড়ন এবং মুষ্টিমেয় সমতলবাসী বাঙালী ব্যবসায়ীদের একাধিপত্যমূলক চরম শোষণ এবং সর্বোপরি তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমতলবাসীদের বসতি স্থাপণে ও ভূমি জবরদখলের প্রেক্ষিতে আদিবাসী জুম্মদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে এই নিপীড়নের মাত্রা চরম আকার ধারণ করে। সঙ্গত কারণে জুম্ম জনগণের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলন দানা বাঁধে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলেও এ পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। সামরিক ও বেসামরিক কর্তাদের অত্যাচার-নির্যাতন, অস্থানীয় বাঙালী ব্যবসায়ীদের শোষণ এবং সমতলবাসীদের অবৈধ বসতি স্থাপন ও জুম্মদের জমি জবর দখল চরম পর্যায়ে উপনীত হয়।

১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ সরকারের নিকট জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকারসহ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী তুলে ধরেন। সরকার দাবী পূরণের পরিবর্তে দমন নীতি গ্রহণ করে। তদুদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে দীঘিনালা, আলিকদম ও রুমায় তিনটি সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৫ সালে দেশে সামরিক শাসন জারী হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে জুম্ম জনগণের উপর সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর অভিযান ও নির্যাতন জোরদার হয়ে উঠে। অতঃপর জুম্ম জনগণকে এ অত্যাচার-নিপীড়ন হতে রক্ষার তথা জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি হতে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে উঠে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বরাবরই রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত রাখে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সরকার একদিকে দমন নীতি ও সরকারী পরিকল্পনাধীনে সমতল জেলাগুলো থেকে বহিরাগত বাঙালী পরিবার বসতি প্রদান এবং অপরদিকে শান্তি আলোচনার সীমিত উদ্যোগ হাতে নেয়। পরে ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে সামরিক বাহিনীর প্রধান ও প্রেসিডেন্ট হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত করে। উক্ত বৈঠকে উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে পরিচিহ্নিত করে এবং রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানে ঐক্যমত্য হয়। জেনারেল এরশাদ সরকারের সাথে ৬ (ছয়) বার, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সাথে ১৩ (তের) বার এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সাথে ৭ (সাত) বার অর্থাৎ মোট ২৬ (ছাব্বিশ) বার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল দেশের সংবিধান অনুসরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক সমাধান করা অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা কায়েম করা, গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বহিরাগত সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন প্রদান ও ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তি, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও স্থায়ী বাঙালীসহ সকল অধিবাসীদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। মোট ৪ (চার) টি খন্ডে বিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

১।	পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। এ লক্ষ্যে চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত মৌলিক বিষয়াদি হচ্ছে- • অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা নির্ধারণ; • স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন ; • সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান ; • ভূমি বন্দোবস্ত বা হস্তান্তরে পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতা; • পার্বত্যাঞ্চলের চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা; • জন্ম-মৃত্যু পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; • ভূমি কমিশন গঠন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ।
২।	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এ লক্ষ্যে - • পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং জুম্মদের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা; • পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং ইহার উপর জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন, পার্বত্য জেলা পরিষদসমুহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় পরিষদসমূহ সমন্বয় ও তত্বাবধান এবং উপজাতীয় সামাজিক বিচারসহ ৮টি বিষয় কার্যকর করা; • তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন এবং উহাদের উপর ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), কৃষি ও বন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, যুব কল্যাণ ও উপজাতীয় প্রথাসহ ৩৩ টি কার্যাবলী বা বিষয় কার্যকর করা; • বিশেষ শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করণার্থে সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা।
৩।	অস্ত্রজমাদান ও সংঘাত নিরসন করা। এলক্ষ্যে- • পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কতৃক সরকারের নিকট অস্ত্র জমাদান: • পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬ (ছয়)টি স্থায়ী সেনানিবাস রাখা। অন্যান্য ৫০০-এর অধিক সেনা, আনসার ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা; • প্রয়োজনে আঞ্চলিক পরিষদের অনুরোধক্রমে বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা।
৪।	পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে- • উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন করা; • আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করা; • ভুমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা; • রাবার চাষের ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জমির লীজ বাতিল করা; • পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অধিক পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা; • উপজাতীয়দের জন্য চাকুরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান করা; • উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করা; • জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও সকল প্রকার মামলা প্রত্যাহার করা; • জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকুরীতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন করা;
৫।	অন্যান্য বিষয়াবলী-

	• পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন উপযুক্ত উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ করা; • পার্বত্যাঞ্চলের সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা; • পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়িত বিষয়সমূহ

১।	১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চুক্তিটি মন্ত্রিপরিষদে পাশ হয় এবং গেজেট জারী করা হয়।
২।	১৯৯৮ সালে চার দফায় জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অস্ত্রজমাদান সম্পন্ন হয় এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন হয়। তাদেরকে জনপ্রতি ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।
৩।	১৯৯৮ সালের ৩, ৪ ও ৫ মে যথাক্রমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮, বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ পাশ করা হয়।
৪।	১৯৯৮ সালের ৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন পাশ করা হয় এবং ১৯৯৯ সালের মে মাসে অন্তবর্তীকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়।
৫।	পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৩১টি সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়।
৬।	২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে জুম্ম শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং অধিকাংশ পরিবারকে অর্থনৈতিক সুবিধাদি প্রদান করা হয়।
৭।	১৯৯৮ সালের ২০ জানুয়ারী প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি পুনর্গঠিত হয় এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু তালিকা প্রস্তুত করা হয়।
৮।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়। (পরে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কমিটির কার্যক্রম স্থগিত হয়)।
৯।	ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয় এবং ১২ জুলাই ২০০১ সালের এই সংক্রান্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন আঞ্চলিক পরিষদ আইন লঙ্ঘন করে প্রণীত হয় ও চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টি ধারা অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
১০।	জনসংহতি সমিতি ও প্রত্যাগত শরণার্থীদের যথাক্রমে ৬৪ জন ও ১৮৪ জনকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। এছাড়া জনসংহতি সমিতির ৬৭৫ জন সদস্যকে পুলিশ কনষ্টেবল পদে এবং ১১ জনকে ট্রাফিক সার্জেন্ট পদে নিয়ো দেয়া হয়।
১১।	জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে আনীত ৮৪৪টি মামলার মধ্যে ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়সমূহ

১।	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ বিধান করা হলেও সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
২।	আইন মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কার্যকর করা হয়নি। সরকার আঞ্চলিক পরিষদ কার্যবিধিমালাসহ অন্য কোন বিধিমালা প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।
৩।	সরকার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট যথাযথ দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। চুক্তির পর পার্বত্য জেলা পরিষদে ন্যস্ত কোন বিষয় হস্তান্তর ও কার্যকর করেনি।
৪।	পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে ৩১টি সেনা ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া হলেও এরপর সরকার কোন

	পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে 'অপারেশন দাবানল'-এর নাম পরিবর্তন করে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন অব্যাহত রাখা হয়।
৫।	সরকার প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ভূমি ফেরৎ দেয়নি। শরণার্থীদের ৪০টি গ্রাম সেটেলার বাঙালীদের জবরদখল হতে মুক্ত করেনি ও ৯,৩২৬ শরণার্থী পরিবারকে তাদের জমিজমা ফেরৎ দেয়নি।
৬।	সরকার আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদেরকে পুনর্বাসন করেনি। পক্ষান্তরে চুক্তি লঙ্ঘন করে ৩৮,১২২টি বহিরাগত সেটেলার পরিবারকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে তালিকাভূক্ত করেছে।
৭।	সরকার জনসংহতি সমিতি ও প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হলেও তাদের অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি।
৮।	সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন করেনি এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে ভূমি কমিশনের কাজ শুরু করেনি। ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ১৯টি ধারা সংশোধনের বিষয়ে ঐক্যমত্য হলেও তা এখনো সংশোধন করা হয়নি।
৯।	রাবার চাষ ও অন্যান্য খাতে প্রদত্ত জমির লীজ এখনো বাতিল করা হয়নি। উপরন্তু এই ধারা লঙ্ঘন করে লীজ দেয়া অব্যাহত রয়েছে।
১০।	স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। পক্ষান্তরে বহিরাগত সেটেলার ও চাকুরীজীবীসহ অস্থায়ী বাসিন্দাদেরকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
১১।	পার্বত্যাঞ্চলের সকল চাকুরীতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার বিধান কার্যকর হয়নি।
১২।	সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান লঙ্ঘন করে সার্কেল চীফের পাশাপাশি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান চালু করা হয়েছে।
১৩।	বর্তমান জোট সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি এখনো পুনর্গঠন করা হয়নি।
১৪।	বর্তমান জোট সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জুম্মদের মধ্য থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়নি। মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি কার্যকর করা হয়নি। মন্ত্রণালয়ে উপজাতীয় ও অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা হতে নিয়োগ দেয়া হয়নি।
১৫।	জনসংহতি সমিতি সদস্যদের দাখিলকৃত ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। সমিতির ৪ জন সদস্যের মোট ২২,৭৮৩ টাকার ব্যাংক ঋণ মওকুফ করা হয়নি।
১৬।	জনসংহতি সমিতির সদস্য ও স্থায়ী বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত আরো ১১৪টি মামলা এবং সামরিক আদালতে দায়েরকৃত মামলাগুলি অপ্রত্যাহৃত রয়ে গেছে। ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এখনো সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়নি।

বর্তমান জোট সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী কার্যকলাপ

১।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাহাড়ীদের মধ্য হতে মন্ত্রী নিয়োগ না করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখা হয়েছে; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে Rules of Business অনুযায়ী কার্যকর করা হচ্ছে না এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নেতিবাচক অবস্থায় রাখা হয়েছে।
২।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে নিয়োগ না করে একজন অউপজাতীয়কে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং আঞ্চলিক পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই বোর্ডকে এ যাবৎ পরিচালনা করা হয়নি। জুম্ম জনগণকে বঞ্চিত করে বোর্ডের অনুকুলে বরাদ্দকৃত কোটি কোটি টাকা চুক্তি বাস্তবয়ানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি কার্যকর না করে কেবলমাত্র সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কাজ পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।
৪।	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন না করে এলজিআরডি মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রিপরিষদ কমিটি গঠন করে কালক্ষেপণ করা হচ্ছে।
৫।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে বাজেট অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে না এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে অকার্যকর অবস্থায় রাখা হয়েছে।
৬।	প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলায় বহিরাগতদের বসতি প্রদান করা হচ্ছে। এলক্ষ্যে আরো নতুন ২৮,০০০ সেটেলার বাঙালী পরিবারকে রেশন প্রদান ও ১০,০০০ বহিরাগত বাঙালী পরিবারকে সাজেক এলাকায় পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে।
৭।	প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তা দিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন-এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ছড়ানো হচ্ছে এবং পাহাড়ী-বাঙালীর মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির অব্যাহত ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে।
৮।	ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির পরিবর্তে জুম্মদের ভূমি জবরদখলের জন্য বহিরাগত সেটেলার বাঙালীদের মদদ দেয়া হচ্ছে এবং এলক্ষ্যে তাদেরকে নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তা প্রদান করা অব্যাহত রয়েছে।
৯।	চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেনাবাহিনী, ইউপিডিএফ ও সমঅধিকার আন্দোলন তথা সেটেলার বাঙালীদের দিয়ে যুগপৎভাবে জনসংহতি সমিতির অস্তিত্ব ধ্বংস করা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
১০।	শান্তকরণ কর্মসূচীর নামে সেনাবাহিনীর বরাবরে প্রতি বছর দশ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ এবং এসব বরাদ্দ চুক্তি পরিপন্থী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।
১১।	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে।

সেনা ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ

১।	বিলাইছড়ি ক্যাম্প থেকে এপিবিএন সদস্যদের প্রত্যাহার করে সেনা সদস্য মোতায়েন (১৭ অক্টোবর ২০০৩); এ সময় উপজেলার সাক্রাছড়ি ক্যাম্প ও গাছকাবাছড়া ক্যাম্পেও এপিবিএন সদস্যদের প্রত্যাহার করে সেনা সদস্য মোতায়েন
২।	রুমা সেনাবাহিনী গ্যারিসন স্থাপনের জন্য ৯,৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ
৩।	বান্দরবন সদর ব্রিগেড সম্প্রসারণের নামে ১৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ;
৪।	বান্দরবানে আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে ৩০,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ
৫।	বান্দরবানে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২৬,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ
৬।	লংগদু জোন সম্প্রসারণের জন্য ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ
৭।	পানছড়ি জোন সম্প্রসারণের জন্য ১৪৩ একর জমি অধিগ্রহণ
৮।	মাটিরাঙ্গা উপজেলায় গোকুলসমমণি কার্বারী পাড়ায় সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন
৯।	কাউখালী উপজেলার ঘাগড়ায় ঘিলাছড়ি মুখ তালুকদার পাড়ার প্রীতি বিকাশ তালুকদার ও সাধন বিকাশ চাকমার ভূমি জবরদখল করে ক্যাম্প স্থাপন (১৬ জুন ২০০৩)
১০।	মানিকছড়ি উপজেলার ২নং বাটনাতলী ইউনিয়নে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন (৫ আগষ্ট ২০০৪)
১১।	লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার লক্ষ্মীছড়ি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে বান্যাছোলা নামক স্থানে সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন (২০০৪)
১২।	কাউখালী উপজেলাধীন খিরাম এলাকায় সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন
১৩।	রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাসা ইউনিয়নের বেতছড়া নামক স্থানে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন (জানুয়ারী ২০০৫)

১৪।	রাজস্থলী উপজেলার বাঙালহালিয়া বাজারে নতুন ক্যাম্প স্থাপন (২০০৫)

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর কালে প্রধান প্রধান সাম্প্রদায়িক হামলা

সাম্প্রদায়িক হামলা	তারিখ	ঘরবাড়ী অগ্নিসংযোগ	ঘরবাড়ী ধ্বংস ও লুটপাট	নিহত	আহত	ধর্ষণ/যৌন হয়রানি
বনরূপা	৩/৭/৯৮	--	১	--	১১	--
বাঘাইহাট	৪/৪/৯৯	--	--	--	৫১	১
বাবুছড়া	১৬/১০/৯৯	--	৭৪	৩	১৪০	১
বোয়ালখালী-মেরুং	১৮/৫/০১	৪২	১৯১	--	৫	--
রামগড়	২৫/৬/০১	১২৬	১১৮	--	অনেক	--
রাজভিলা	১০/১০/০২	১১	১০০	--	৩	--
ভূয়াছড়ি	১৯/৪/০৩	৯	--	--	১২	--
মহালছড়ি	২৬/৮/০৩	৩৫৯ (১৪ গ্রাম)	১৩৭	২	৫০	১০

বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের সকল সম্ভাবনা নস্যাৎ হতে চলেছে। বর্তমান চার দলীয় জোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে নানাভাবে পদদলিত করে চলেছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার মর্যাদা চিরতরে ক্ষুন্ন করার পাঁয়তারা চলছে।

সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে চলেছে। 'অপারেশন উত্তরণ'-এর নামে একপ্রকার সেনাশাসন বলবৎ থাকার কারণে এবং পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার না করার ফলে একাধারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক সুশাসন গড়ে উঠতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, অপরদিকে পাহাড়ী-বাঙালী স্থায়ী বাসিন্দাদের উপর জুলুম-নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করেছে। সন্ত্রাসী তল্লাসীর নামে নির্বিচারে ধর-পাকড়, মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেল-হাজতে প্রেরণ, বেগার শ্রম দিতে বাধ্য করা ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহতভাবে চলছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বানচাল করা তথা পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী সাম্প্রদায়িক উম্মাদনাকে উস্কে দিচ্ছে। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন' নামে একটি উগ্র জাতীয়তবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক ফ্রন্ট খুলে পার্বত্য চট্টগ্রামে জঘন্য সাম্প্রদায়িক তান্ডবতা শুরু করেছে। সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে তথাকথিত এই সমঅধিকার আন্দোলন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বানচাল করার ষড়যন্ত্র করা; নানা অজুহাতে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত করা; জনসংহতি সমিতিসহ স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন সংগঠনের কর্মসূচী বিরোধীতা করা ও এর বিরুদ্ধে পাল্টা কর্মসূচী প্রদান করা, জুম্মদের ভূমি জবরদখলে সেটেলার বাঙালীদের সহায়তা করা ইত্যাদি নাশকতা ও সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে ফাঁসি দাবী করা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবি ও গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন ও প্রখ্যাত সাংবাদিক মতিউর রহমানসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কাউকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাঞ্চিত ঘোষণা দিয়ে কখনো প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে হামলা, কারো বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র সাম্প্রদায়িক তৎপরতা ও সেনাশাসনের সুযোগে ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো সারাদেশের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামেও ঘাঁটি গড়ে তুলছে। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে অবৈধ অস্ত্রভান্ডারের হোতা মায়ানমারের মুসলিম জঙ্গীরাও বাংলাদেশের জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব ইসলামি উগ্রপন্থী সংগঠনসমূহ থেকে বাংলাদেশী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে নানা সহযোগিতা পেয়ে চলেছে। বিশেষ করে অস্ত্র, গোলবারুদ ও বিস্ফোরক সংগ্রহ এবং বোমা তৈরির প্রযুক্তি-প্রশিক্ষণ কাজে বাংলাদেশী জঙ্গিদেরকে এসব বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সাহায্য দিয়ে আসছে। এ পরিস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীসহ সারাদেশের জন্য চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামী জঙ্গি তৎপরতা ও উগ্র সাম্প্রদায়িক অপতৎপরতা প্রতিরোধকল্পে, সর্বোপরি দেশে গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। তাই সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ' ও অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জোরদার সংগ্রামে অধিকতর পরিমাণে সামিল হওয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি

সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালী স্থায়ী অধিবাসী এবং দেশের সকল গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল শক্তিকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

*****

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ অপপ্রচার ও বাস্তবতা

পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ৫,০৮৯ বর্গ মাইল বা ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার যা দেশের মোট আয়তনের (৫৬,৯৭৭ বর্গ মাইল বা ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার) মাত্র ৯%। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার। তম্মধ্যে আদিবাসী জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালী জনসংখ্যা মাত্র ৯ লক্ষের মত। বাকীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা সেটেলার বাঙালী।

সারাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় ০.২২ একর। অপরপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ৩.১% জমি তথা ১২৪,১৬০ একর। ফলতঃ পার্বত্যাঞ্চলের ৯ লক্ষ স্থায়ী অধিবাসীর মধ্যে মাথাপিছু চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ০.১৪ একর। কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্যান চাষের উপযোগী ভূমির পরিমাণ ১৮.৭% বা ৭৫৫,৮৪০ একর এবং ৫.৩% বা ২১৪,৪০০ একর পানি ও বসতি এলাকা। অবশিষ্ট ৭২.৯% বা ২৯৪৩,৩৬০ একর ভূমি খাড়া পাহাড় ও পর্বত বিধায় কেবল বন করার উপযোগী ।

ব্রিটিশ শাসনামলে এ অঞ্চলের অনগ্রসর আদিবাসী ভূমি অধিকার ও আর্থ-সামাজিক জীবন যাতে বিপন্ন হয়ে না পড়ে তার জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌজাধীন ভূমির উপর মৌজাবাসীদের যৌথ মালিকানাস্বত্ব প্রচলিত ছিল। অপরদিকে উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতিরেকে ভূমি হস্তান্তরে বাধানিষেধের বিধান রাখা হয়েছিল। পাশপাশি অপরাপর সমতল অঞ্চল হতে জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করার ও ভূমি লীজ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করার বিধান করা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান শাসনামলে সমতলবাসী কর্মকর্তাদের বিরোধিতার কারণে এসব বিধান সঠিকভাবে কার্যকর হতে পারেনি। এ দেশ স্বাধীন হবার পর পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যাগত চিত্র অভূতপূর্বভাবে পরিবর্তিত হয়। যেমন-

বছর		১৯৪৭	১৯৫১	১৯৮১	১৯৯১
আদিবাসী	জনসংখ্যা		২৬৯,১৭৭	৪৪১,৭৪৪	৫০১,১৪৪
	শতকরা	৯৮.৫%	৯৪%	৫৯%	৫১%
আদিবাসী নয়	জনসংখ্যা		১৮,০৭০	৩১৩,১৮৮	৪৭৩,৩০১
	শতকরা	১.৫%	৬%	৪১%	৪৯%

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রাকৃতিক কারণে ভূমির উর্বরতা ও চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যতঃ ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা দেশের অপরাপর অঞ্চল হতে বেশী। বর্তমানে আদিবাসী পাহাড়ীদের মধ্যে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৬০% ভাগ আর অপাহাড়ী স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৫০% ভাগ। অপরদিকে সমতল অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বাঙালীদের মধ্যে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৮০% ভাগ। এ জন্য সেটেলার বাঙালীদের ১৯৭৯ হতে অদ্যাবধি সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহকৃত রেশন ও অন্যান্য সুবিধাদি এবং বৈধ ও অবৈধভাবে ব্যাপকহারে আহরণকৃত বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এতদসত্বেও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন বেশী, মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে মর্মে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে। কারণ হলো একটাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ ও কৃষিজ সম্পদ লুণ্ঠন করার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আদিবাসীদের উৎখাত করে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বার্থান্বেষী মহলের শোষণ-শাসনের জমিদারীত্ব স্থায়ী করা। এলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি উত্তরকালে পূর্বেকার জাতিগত নির্মূলীকরণের নীতি বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতির দু'টি কথা

আজ ২রা ডিসেম্বর ২০০৫ ইংরেজী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৮ম বর্ষপূর্তি দিবস। আজ আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অধিবাসীসহ দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের প্রেক্ষাপটে জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ও মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ যারা নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের সকলের মহান অবদানের কথা চরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পশ্চাতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল মহলের সহযোগিতা ও সমর্থন কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যদিও জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী সরকার, রাষ্ট্র, সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের নিকট সমাদৃত হয়েছে কিন্তু এ চুক্তি আজ অবধি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যেই এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে একপ্রকার সেনাশাসন বলবৎ রয়েছে। সেনাশাসন, বেআইনী অনুপ্রবেশ, ভূমি বেদখল, বহিরাগত সেটেলারদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক হামলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক অপতৎপরতা, বেকারত্ব, দুর্নীতি, দলীয়করণ নীতির ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে চরম নিরাপত্তাহীনতা বিরাজমান। সরকারের সদিচ্ছার অভাব ও শাসকগোষ্ঠীর একটা বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আজ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এ চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান জোট সরকারের কোন ইতিবাচক লক্ষণ আজ অবধি প্রতীয়মান হয়নি। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির নয়, দেশের অপরাপর অঞ্চলের আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা আজ অধিকতর সঙ্গীন অবস্থায় রয়েছে।

বলাবাহুল্য, ইসলামী সম্প্রসারণবাদের ষড়যন্ত্রে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমির অধিকার তথা জন্মভূমির অস্তিত্ব আজ প্রান্তিক সীমানায় পৌঁছে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এ চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন অনস্বীকার্য। অতএব আজ এই দিনে চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের স্বার্থে আন্তর্জাতিক মহলকে অধিকতর সমর্থন দানের আহ্বান জানাই। চুক্তি বাস্তবায়নে অধিকতর ভূমিকা রাখার জন্য আবেদন জানাই এ দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল দল, সংগঠন, ব্যক্তিবর্গকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে অধিকতর সামিল হওয়ার জন্য জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের উদাত্ত আহ্বান জানাই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দেশে যতদিন না একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক সরকার প্রতিষ্ঠা পাবে ততদিন এ চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না এবং দেশের মেহনতি দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তিও আসতে পারে না। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের পাশাপাশি দেশে একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক গণমুখী সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ও পার্বত্যবাসীকে একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানাই।◆

বিশেষ প্রতিবেদন

মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা

১. ঘটনা

গত ৩ এপ্রিল ২০০৬ সকাল প্রায় ৮:৩০ টায় আনুমানিক প্রায় ১৫০ বাঙালী সেটেলার ধারালো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের সাপ্রু কার্বারী পাড়া, নুয়া পাড়া, চক্র পাড়া, পাইসি মহাজন পাড়া ও পথা পাড়া নামক পাঁচটি জুম্ম গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। হামলায় ২ (দুই) জন জুম্ম নারী ধর্ষণের শিকার হয় এবং ৫০ (পঞ্চাশ) জনের অধিক জুম্ম গ্রামবাসী আহত হয়। আহতদের মধ্যে ধর্ষিতা ২ জনসহ ১১ (এগার) জন গ্রামবাসীকে খাগড়াছড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে একজনকে মারাত্মক জখম অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। শতাধিক জুম্ম ঘরবাড়ী লুটপাট করা হয় এবং গৃহসামগ্রী তছনছ করা হয়। এই এলাকায় জুম্মদের ভূমি বেদখলের অব্যাহত প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বাঙালী সেটেলারদের দ্বারাই এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়।

মারাত্মক আহত টুকুমনি চাকমা

২. পটভূমি

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। কিন্তু সরকার এই চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি। পক্ষান্তরে সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও জোরপূর্বক ভূমি বেদখল এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে বাঙালী সেটেলারদের নতুন অভিবাসন প্রক্রিয়াকেই সরকার অব্যাহতভাবে পৃষ্টপোষকতা দিয়ে আসছে।

গত ২০০০-২০০১ সালে মহালছড়ি সেনা জোন ও পাকুজ্যাছড়ি সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রামের বাঙালী সেটেলাররা মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নাধীন জয়সেন কার্বারী পাড়ার জুম্মদের নামে রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় ভূমি জোরপূর্বক বেদখল করে। সেটেলাররা বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও সরকারী কর্তৃপক্ষের আর্থিক সহযোগিতায় বাড়ীঘর নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে তাদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করে।

এরপর গত ২০০৪-২০০৫ সালে মহালছড়ি সেনা জোন ও কিয়াংঘাট সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাঙালী সেটেলাররা মহালছড়ি উপজেলাধীন কিয়াংঘাট ও লেমুছড়ি এলাকায় জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় ভূমিতে তাদের গুচ্ছগ্রাম এলাকা সম্প্রসারণ করে। অনুরূপভাবে গত ২৯ জানুয়ারী থেকে ৩১ মার্চ ২০০৬-এর মধ্যে নুনছড়ি গুচ্ছগ্রামের বাঙালী সেটেলাররা সদ্য বসতিকারী সেটেলার বাঙালীদের সাথে নিয়ে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গামারীঢালা এলাকার জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় ভূমিতে প্রায় ১৫০টি ঘরবাড়ী নির্মাণ করে।

গত ১ এপ্রিল ২০০৬ হতে নুনছড়ি গুচ্ছগ্রাম ও জয়সেন কার্বারী পাড়ার বাঙালী সেটেলাররা সাপ্রু কার্বারী পাড়াস্থ ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধ শিশুঘর অনাথাশ্রম ও জুম্ম গ্রামবাসীদের ভূমিতে বাড়ীঘর নির্মাণের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করতে শুরু করে। প্রত্যেক দিন তারা সাম্প্রদায়িক হামলা চালানোর জন্য জুম্মদের হুমকী প্রদর্শন করে।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে এটা সুস্পষ্ট যে জুম্মদের ভূমিতে বাঙালী সেটেলারদের ভূমি বেদখল ও গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণের জন্যই এটা ছিল পরিকল্পিত এক সাম্প্রদায়িক হামলা।

৩. ঘটনার বিবরণ

গত ২ এপ্রিল ২০০৬ জয়সেন কার্বারী পাড়া হতে একদল বাঙালী সেটেলার মহিলা সাপ্রু কার্বারী পাড়ায় গিয়ে আদিবাসী জুম্মদের মালিকানাধীন ভূমিতে বাড়ীঘর নির্মাণ করতে শুরু করে। এ সময় সাপ্রু কার্বারী পাড়ার কয়েকজন জুম্ম মহিলা বাঙালী সেটেলার মহিলাদের বাঁধা দেয়। এই ঘটনার পরবর্তীতে ৩ এপ্রিল ২০০৬ সকাল প্রায় ৮:৩০ টায় বাঙালী সেটেলার মহিলারা

প্রথমে সাপ্রু কার্বারীর জুম্মদের ঘরবাড়ীতে ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে। এর প্রতিবাদ করতে থুইম্রাজাই মারমা (১৬) পীং মমং মারমা ও ক্রাজাই মারমা (২০) পীং রিপ্রুচাই মারমা নামের দুই জুম্ম তরুনী যখন বাড়ীর বাইরে আসে তখন বাঙালী সেটেলাররা তাদেরকে চিরকালের জন্য এই স্থান ত্যাগ করতে বলে। জুম্ম মহিলারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে বাঙালী সেটেলাররা তখন তাদেরকে আক্রমণ করে। তাদের চিৎকার শুনে তরুনীদ্বয়ের মা যথাক্রমে আবাইক্রাই মারমা স্বামী মমং মারমা ও মিয়াসু মারমা (৪৮) স্বামী রিপ্রুচাই মারমা ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে আসে। তখন সেটেলাররা এই চারজন জুম্ম মহিলাকে ধরে ফেলে এবং রশি দিয়ে বেঁধে জয়সেন কার্বারী পাড়ার একটি সেটেলার বাঙালী ঘরে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেখানে বাঙালী সেটেলাররা তাদেরকে পাশবিক কায়দায় মারধর করে এবং প্রথমোক্ত দুই তরুণীকে ধর্ষণ করে।

এ সময় ঘটনাস্থলের পাশ দিয়ে মাইসছড়ি বৌদ্ধ শিশুঘর অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীমৎ সুমনা মহাথের মহালছড়ি বাজারে যাচ্ছিলেন। জুম্ম নারীর চিৎকার শুনে তিনি ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যান। কিছু দূর গিয়েই তিনি ঐ জুম্ম নারীদের অচেতন ও নগ্ন অবস্থায় দেখতে পান। তিনি যখন তাদের রক্ষা করতে যান তখন তাঁর উপরও বাঙালী সেটেলাররা আক্রমণ করে এবং এক পর্যায়ে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে রক্ষা পান।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ট্রাকে করে মাইসছড়ি ইউনিয়নাধীন নুনছড়ি গুচ্ছগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার একদল বাঙালী সেটেলার লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং জয়সেন কার্বারী পাড়া গুচ্ছগ্রাম থেকে আসা হামলাকারী সেটেলারদের সাথে হামলায় যোগ দেয়। প্রথমে তারা নোয়া পাড়ার রাস্তার পাশে টুকুমনি চাকমা (৩০) পীং আশাপূর্ণ চাকমাকে পেয়ে তাকে সংঘবদ্ধভাবে এলোপাতাড়ি দা দিয়ে কোপাতে থাকে। তাকে মৃত ভেবে রাস্তার পাশে ফেলে রেখে যায়। এরপর আনুমানিক প্রায় ১৫০ জনের সংঘবদ্ধ বাঙালী সেটেলাররা সাপ্রু কার্বারী পাড়া, নোয়াপাড়া, চক্রপাড়া, পাইসি মহাজন পাড়া ও পথা পাড়ায় আক্রমণ চালায়। তারা নির্বিচারে জুম্মদেরকে আঘাত করে। তারা জুম্মদের ঘরবাড়ী লুটপাট চালায় এবং গৃহ সামগ্রী তছনছ করে দেয়।

সেটেলার বাঙালীদের আচমকা আক্রমণে জুম্ম গ্রামবাসীরা হতচকিত হয়ে পড়ে এবং ঘরবাড়ী ও গ্রাম ছেড়ে দিকবিদিক পালিয়ে যায়। সাপ্রু কার্বারী পাড়া, পাইসি মহাজন পাড়া ও পথা পাড়ার মারমা গ্রামবাসীরা মাইসছড়ি পুরাতন বাজারের সন্নিকটস্থ বলি পাড়ার আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে ও বলি পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহে আশ্রয় নেয়। অপরদিকে নোয়াপাড়া ও চক্রপাড়াসহ মানিকছড়ি রবিচন্দ্র কার্বারী পাড়া, বিন্দু কুমার চেয়ারম্যান পাড়া ও মানিকছড়ি মাষ্টার পাড়ার চাকমা গ্রামবাসীরা পার্শ্ববর্তী বিহার পাড়া, যাদুগানালা, করল্যাছড়ি, বিশ্বজিৎ চেয়ারম্যান পাড়া, পূর্ব মানিকছড়ি, উল্টাছড়ি, দাঁতকুপ্যা, ঘাটগড় পাড়া ও অপর্ণা মহাজন পাড়ায় আশ্রয় নেয়।

৪. হতাহত

হামলায় প্রায় ৫০ জনের অধিক জুম্ম আহত হয়। তাদের মধ্যে ১১ জন নারী-পুরুষ খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আহত জুম্ম গ্রামবাসীরা হল-

১। মিঃ টুকুমনি চাকমা (৩০), পীং- আশাপূর্ণ চাকমা, গ্রাম- নুয়াপাড়া, মাইসছড়ি;
২। মিঃ জুনাল মারমা (৩৫), পীং- উহ্লা অং মারমা, গ্রাম- নুয়াপাড়া, মাইসছড়ি;
৩। মিঃ সাপ্রু মারমা (৬৫), পীং- মৃত নিশি মারমা, গ্রাম- সাপ্রু কার্বারী পাড়া;
৪। মিস থুইম্রাজাই মারমা (১৬), পীং- মৃত মমং মারমা, গ্রাম- সাপ্রু কার্বারী পাড়া;
৫। মিসেস মিয়াসু মারমা (৪৮), স্বামী- রিপ্রু চাই মারমা, গ্রাম- সাপ্রু কার্বারী পাড়া;
৬। মিস ক্রাজাই মারমা (২০), পীং- রিপ্রু চাই মারমা, গ্রাম- সাপ্রু কার্বারী পাড়া;
৭। মিঃ মংশু মারমা (৭০), পীং- মৃত বাইচা মারমা, গ্রাম- সাপ্রু কার্বারী পাড়া;
৮। মিঃ মংসানাই মারমা (২৬), পীং- ক্রাই অং মারমা, গ্রাম- চক্রপাড়া;
৯। মিঃ কংজাই মারমা (১৮), পীং- রিপ্রু চাই মারমা, গ্রাম- চক্রপাড়া;
১০। মিঃ মংঞ্রো মারমা, পীং- মৃত বাইচা মারমা, গ্রাম- চক্রপাড়া;
১১। মিঃ মংপাই মারমা, পীং- কংজা অং মারমা, গ্রাম- চক্রপাড়া।

তাদের মধ্যে আশংকাজনকভাবে আহত টুকুমনি চাকমাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার মাথা, কাঁধ ও শরীরের অন্যান্য অংশে মারাত্মকভাবে কোপানো হয়। এছাড়া মাইসছড়ি চৌধুরী পাড়ার মিসেস অংক্রা মারমা (৫২) স্বামী থোয়াইঅং মারমার পা ভেঙ্গে যায়। তাকে হাসপাতালে চিকিৎসার পরিবর্তে দাঁতকুপ্যা মুখ পাড়ায় বৈদ্য চিকিৎসা করা হয় বলে জানা যায়।

অপরদিকে আক্রমণকারী সেটেলার বাঙালীদের মধ্যে নিম্নোক্ত সেটেলার বাঙালীরা আহত হয়ে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়-

১। চান মিয়া (৩০), পীং- জুলু শাইখ, গ্রাম- জয়সেন কার্বারী পাড়া;
২। হাওয়া খাতুন (৩০), স্বামী- ইদ্রিস আলী, গ্রাম- জয়সেন কার্বারী পাড়া;
৩। জয়গুন নেছা (৩৫), স্বামী- আবদুল মান্নান, গ্রাম- জয়সেন কার্বারী পাড়া;
৪। হাফিজুর রহমান (১৯), পীং- মহিউদ্দীন, গ্রাম- জয়সেন কার্বারী পাড়া।

৫. ক্ষয়ক্ষতি

হামলায় সেটেলার বাঙালীরা জুম্মদের এক শতাধিক ঘরবাড়ী লুটপাট ও তছনছ করে। তম্মধ্যে সাপ্রু কার্বারী পাড়ায় ৩০টি, পাইসি মহাজন পাড়ায় ৩৯টি, নুয়াপাড়ায় ৯টি ও পথাপাড়ায় ২২টি ঘরবাড়ী লুটপাট করা হয় এবং মূল্যবান সামগ্রী ধ্বংস করা হয়। এছাড়াও বৌদ্ধ শিশুঘর অনাথাশ্রমের হোস্টেল, রান্নাঘর ও অন্যান্য ঘরবাড়ী ধ্বংস ও লুটপাট করা হয়।

৫. হামলাকারী

নুনছড়ি ও জয়সেন কার্বারী পাড়া গুচ্ছগ্রামের আনুমানিক প্রায় ১৫০ বাঙালী সেটেলার এই আক্রমনে অংশগ্রহণ করে। তম্মধ্যে নুনছড়ি গুচ্ছগ্রামের নিম্নোক্ত সেটেলাররা হামলায় নেতৃত্ব প্রদান করেছে বলে জানা গেছে। তারা হল-

১) মোঃ মোস্তফা (৪০), পীং- মৃত মুজুবুর রহমান
২) মোঃ ফজলুল রহমান (২৫), পীং- মৃত মোসলেম উদ্দিন
৩) মোঃ কাসেম (২৫), পীং- মৃত মোসলেম উদ্দিন
৪) লাল মিয়া (২৮), পীং- আহমাদ মোতালেব
৫) সাত্তার মিস্ত্রি (৩৭), পীং- অজ্ঞাত
৬) মোঃ গফুর (৩০), পীং- মৃত কবির আহমেদ
৭) শামসু (২৮), পীং- নূরুল ইসলাম
৮) রুহুল আমিন (৩৫), পীং- মবিন মিঞা
৯) মোঃ শহীদ (২৮), পীং- লতিফ খান
১০) আমান উল্লাহ (২৯), পীং- আদান হক
১১) সুরজ মিঞা (২৬), পীং- মফিজ মিঞা
১২) ইয়াকুব আলী ওরফে বাহার (৪২), পীং- মৃত মবিন মিঞা
১৩) মিঞা খান (২৬), পীং- মোঃ আব্দুল
১৪) হোসেন আলী (৩৫), পীং- দুলু মিঞা
১৫) নারায়ণ (২২), পীং- অজ্ঞাত
১৬) ফিরোজ মিঞা (৩৫), পীং- আবদুল আলী
১৭) মোঃ সোহেল (২৪), পীং- জহির উদ্দিন
১৮) আবু সামাদ (৩৫), পীং- আবদুর রহমান
১৯) তপন দাশ (২৫), পীং- নারায়ণ দাশ
২০) আবুল বারাত (৩৮), পীং- মৃত হাফেজ আহমদ লতিফ
২১) মোঃ মনির হোসেন (৪০), পীং- আবদুর রহমান

এছাড়া ধর্ষণকারী ৯ জন বাঙালীর মধ্যে যাদের নাম পরিচয় জানা গেছে, তারা হল- (১) বাবু, (২) কাউসার, (৩) সবুর আলী ও (৪) আমিনুল।

৬. নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা এবং পাল্টা পদক্ষেপ

সাপ্রু কার্বারী পাড়াস্থ ঘটনাস্থল হতে মাত্র ১৫০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত নোয়াপাড়া বাঙালী গুচ্ছগ্রামের আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) ক্যাম্প। হামলা চলাকালে নিরস্ত্র ও নিরীহ জুম্মদের রক্ষা করতে ক্যাম্প কমান্ডার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। মহালছড়ি থানা এবং মহালছড়ি সেনা জোন ঘটনাস্থল হতে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। মহালছড়ি থানা হতে পুলিশ ও জোন থেকে সেনা সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার দেড় ঘন্টা পর। এর মধ্যেই সবকিছু ঘটে যায়। অপরদিকে নুনছড়ি গুচ্ছগ্রাম সেনা ক্যাম্প মাত্র ২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। নুনছড়ি গুচ্ছগ্রামের বাঙালী সেটেলারদের মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রস্তুতিকালে সেনা ক্যাম্প তাদের প্রতিরোধে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি।

অথচ ঘটনা শুরু হতে না হতেই সেনা সদস্যরা নিরাপত্তার ছলনা করে ঐদিন বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত কোন সাংবাদিক বা জুম্ম নেতাদের কর্তৃক ঘটনাস্থল পরিদর্শনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এমনকি গত ৭ এপ্রিল ২০০৬ বিজিতলা সেনাক্যাম্পের (৩২ বেঙ্গল) মেজর বশির উদ্দিন চৌধুরী ঢাকা থেকে আসা একদল সাংবাদিককে নুনছড়ি ও লেমুছড়ি এলাকা পরিদর্শনে অনুমতি না দিয়ে তাদেরকে খাগড়াছড়ি সদরেই ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়।

৭. গ্রেফতার ও মুক্তি

গত ৪ এপ্রিল ২০০৬ মহালছড়ি থানার পুলিশ সাপ্রু কার্বারী পাড়া হতে ৬ জন নিরীহ জুম্মকে গ্রেফতার করে। পুলিশ অবশ্য ঘটনাস্থল হতে ২৪ জন বাঙালী সেটেলারকেও গ্রেফতার করে, যারা আবার তিন দিন পরেই ৭ এপ্রিল ২০০৬ জামিনে ছাড়া পায়। ক্ষমতাসীন দল বিএনপির নেতারাই তাদের জামিনে তদ্বির করে। এমনকি যতক্ষণ পর্যন্ত না বাঙালী সেটেলাররা জামিন

পায় ততক্ষণ পর্যন্ত বিএনপি নেতারা আদালতে উপস্থিত জুম্ম নেতাদের যেমন- মাইসছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাজাই মারমাকে আদালতে একপ্রকার আটক করে রাখে। পরবর্তীতে ৯ এপ্রিল ২০০৬ উক্ত আটককৃত ৬ জন নিরীহ জুম্ম ছাড়া পায়। তারা হল-

১। প্রিয় রঞ্জন চাকমা (২২), পীং- মৃত শান্তি রঞ্জন চাকমা, গ্রাম- জয়সেন কার্বারী পাড়া;
২। তাক্কুলো চাকমা (২২), পীং- মৃত শান্তিময় চাকমা, গ্রাম- চিত্তরঞ্জন কার্বারী পাড়া;
৩। নিহার রঞ্জন চাকমা (২৫), পীং- রত্নসেন কার্বারী, গ্রাম- মানিকছড়ি রত্নসেন কার্বারী পাড়া;
৪। সাজাই মারমা (২৫), পীং- মংসাজাই মারমা, গ্রাম- মানিকছড়ি রত্নসেন কার্বারী পাড়া;
৫। সুমতি লাল চাকমা (১৯), পীং- রমেন্দ্র লাল চাকমা, গ্রাম- মানিকছড়ি রত্নসেন কার্বারী পাড়া;
৬। সহেল চাকমা (১৯), পীং- প্রীতিময় চাকমা, গ্রাম- পূর্ব মানিকছড়ি।

৮. মামলা দায়ের

গত ৩ এপ্রিল ২০০৬ মহালছড়ি থানায় সাপ্রু কার্বারী পাড়ার জুম্ম গ্রামবাসী ক্যজাই মারমা পীং লাব্রেচাই মারমা কর্তৃক একটি মামলা (জিআর নং ৮৬/২০০৬) এবং জয়সেন কার্বারী পাড়ার বাঙালী সেটেলার হাসিনা বেগম স্বামী মোঃ আবদুল হাই কর্তৃক একটি মামলা (জিআর নং ৮৫/২০০৬) দায়ের করা হয়। পুলিশ প্রকৃত আসামীদের গ্রেফতার করতে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি।

৯. প্রতিবাদ

গত ৩ এপ্রিল ২০০৬ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি খাগড়াছড়ি জেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। অপরদিকে সেদিন খাগড়াছড়ি নাগরিক ফোরাম ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং হামলার নিন্দা জানান। ঐদিন খাগড়াছড়ি ভিত্তিক লিগ্যাল এইড রিসার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক ই-রিলিজে এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়।

তার পরদিন ৪ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। ঐদিন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) হামলার প্রতিবাদে ঢাকা ও চট্টগ্রামে মিছিলের আয়োজন করে। আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনসমূহও এই মিছিলে যোগদান করে একাত্মতা ঘোষণা করে। সেদিন মারমা উন্নয়ন সংসদও ঘটনার নিন্দা জানিয়ে খাগড়াছড়িতে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে। তারা হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রেরণ করে।

গত ৮ এপ্রিল ২০০৬ বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আন্দোলন ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির হায়দার আকবর খান রণো, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দলের আবুল হালিম শাহাবুদ্দিন, অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, লেখক বিপ্রদাস বড়ুয়া, হায়াৎ মামুদ, হিলারো ফয়েজী, শরিফুজ্জামান শরিফ, জেমস ওল্‌ন কক্সি, রিপন চন্দ্র বর্মন প্রমুখ।

গত ৯ এপ্রিল ২০০৬ পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ-বাংলাদেশ খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় মিছিল বের করে। আদিবাসী ভিক্ষু সোসাইটিও রাঙ্গামাটিতে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। তারা হামলার নিন্দা ও ন্যায়বিচারের দাবী জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রেরণ করে।

এছাড়া নেপালের আদিবাসী নেতৃবৃন্দ, শ্রীলঙ্কা ভিত্তিক বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিক্ষু সংঘ, লন্ডন ভিত্তিক সার্ভাইভেল ইন্টান্যাশনাল, জাপান ভিত্তিক জুম্ম নেটের উদ্যোগে ২৭টি সংগঠন ও ২৫৩ জন ব্যক্তি, অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক ইউনাইটেড জুম্ম ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি সংগঠন ও মানবাধিকার কর্মীরা ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফরজ্জামান বাবর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রী মণিস্বপন দেওয়ানের নিকট চিঠি পাঠিয়েছে।

১০. দাবীনামা

জুম্ম জনগণ অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধানতঃ নিম্নোক্ত দাবীগুলো উত্থাপন করেন-

১। ক্ষতিগস্ত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ এর ব্যবস্থা করা;
২। নিগৃহীত নারীদের অবিলম্বে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
৩। হামলায় জড়িত বাঙালী সেটেলারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং জুম্মদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা;

৪। বৈধ মালিক তথা আদিবাসী জুম্ম ও মাইসছড়ি বৌদ্ধ শিশুঘর অনাথাশ্রম এর নিকট জমি ফিরিয়ে দেয়া;
৫। বাঙালী সেটেলারদের তাদের গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে তাদেরকে সম্মানজনক পুনর্বাসন করা;
৬। সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ'সহ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা;
৭। অবিলম্বে যথাযথভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা।

গত ৫ এপ্রিল ২০০৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রানসামগ্রী ও নগদ অর্থ প্রদান এবং বাঙালী সেটেলারদের তাদের পূর্বেকার স্ব স্ব গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার বরাবরে দুইটি আবেদন পত্র পেশ করেন। উল্লেখ্য যে, জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীপরিষদ কমিটির সভাপতি।

১১. সাংবাদিক, রাজনৈতিক দল ও মানবাধিকার কর্মীদের সফর

গত ৩ এপ্রিল ২০০৬ শ্রীমৎ সুমনালংঙ্কার মহাথেরো ও সন্তোষিত চাকমা বকুলের নেতৃত্বে খাগড়াছড়ি জেলা নাগরিক ফোরাম এবং পার্বত্য বৌদ্ধ মিশন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা ঘটনা সম্পর্কে ভূক্তভোগীদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত হন।

গত ৬ এপ্রিল ২০০৬ ঢাকা থেকে একদল সাংবাদিক সাপ্রু পাড়া ও অন্যান্য আক্রান্ত পাড়া পরিদর্শন করে। সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন দৈনিক ভোরের কাগজের ইখতিয়ার উদ্দিন, ডেইলী স্টারের পিনাকী রায়, যুগান্তরের সিরাজুল ইসলাম আবেদ, জনকণ্ঠের আলমগীর স্বপন, সংবাদের শেখ আব্দুল্লাহ এবং সাপ্তাহিক একতার রাজীব ত্রিপুরা। তবে পরের দিন ৭ এপ্রিল ২০০৬ তারা নুনছড়ি ও লেমুছড়ি এলাকায় পরিদর্শনে যেতে চাইলে বিজিতলা সেনা ক্যাম্পে (৩২ বেঙ্গল) কমান্ডার মেজর বশির আহমেদ চৌধুরী তাদেরকে বাঁধা প্রদান করেন।

গত ৯-১০ এপ্রিল ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড, ঢাকা বার কাউন্সিল, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, এএলআরডি, নিজেরা করি, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি ও বাংলাদেশ মহিলা সমিতির ১২ সদস্যের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

গত ১০ এপ্রিল ২০০৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য রক্তোৎপল ত্রিপুরা ও জাফর আহমদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। খাগড়াছড়ি জেলার সহকারী কমিশনার আজমল এসময়ে তাদের সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন।

গত ১০ এপ্রিল আওয়ামীলীগের একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সংসদীয় দলের সদস্য হিসেবে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল ফারুক খান এমপি, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আসমা আমিন এমপি, ফজলে করিম এমপি, রফিকুল আনোয়ার এমপি এবং আবু বকর এমপি।

অপরদিকে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে গত ১৭ এপ্রিল ও ২১ এপ্রিল দুই দফায় কতিপয় জাতীয় সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের কয়েকজন সাংবাদিক হেলিকপ্টারে করে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়। তারা সেটেলার অধ্যুষিত অঞ্চল ঘুরে এবং কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের সাক্ষাৎকার নিয়ে ঘটনার বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে সংবাদ প্রচার করে।

১১. বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমান পরিস্থিতি এখনো থমথমে অবস্থায় বিরাজ করছে। ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা তাদের বাড়ীঘরে ফিরে আসলেও সেটেলার বাঙালীরা এখনো ভূমি জবরদখল ও ঘরবাড়ী নির্মাণ অব্যাহত রেখেছে। সেটেলার বাঙালীরা বেদখলকৃত জায়গা-জমি অবস্থান করায় এবং দফায় দফায় ভূমি জবরদখলের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার কারণে যে কোন সময় আবারও জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা হতে পারে বলে স্থানীয় অধিবাসীরা আশঙ্কা করছে।

১২. সরকারের পদক্ষেপ

সরকার এই ঘটনার ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমনকি খাগড়াছড়ি জেলার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেনি। শুধু অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ৩ এপ্রিল ২০০৬ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান।◆

THE PROTEST LETTERS ON MAISCHARI COMMUNAL ATTACK WRITTEN BY HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS AND ACTIVISTS ARE GIVEN BELOW

Letter written by Mr. Maheswor Shrestha, a member of the Newar indigenous nationality of Nepal

April 05, 2006

Subject: Attacks on CHT Indigineous People

To,
Mrs. Khaleda Zia,
Rt. Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh,
Prime Minister's Office,
Old Parliament House,
Tejgaon, BANGLADESH

Your Honorable,

We have received information that conflicts appertaining to land right are on going between the indigenous people of Chittagong Hill Tract and Muslim Bengali settlers. The recent violent attacks by the Muslim Bengali settlers on the indigenous people of Mahalchari of Khagrachari Hill District is a glaring example where more than 30 indigenous people were seriously wounded, 2 indigenous girls were raped and 1 Buddhist monk is said to be still missing.
We are told that the conflict developed since mid 2005 as the dominant Muslim Bengali settlers have been illegally and forcibly occupying titled indigenous people's lands. Backed by the Bangladesh army, 80 of such settlers in Bichi Tola and 70 in Nunchari have illegally occupied land. Similar incidents have already happened at different places under Khagrachari Sadar and Mahalchari Unions.

As a member of an indigenous people of Nepal, I vehemently condemn the above heinous acts perpetrated onto the innocent CHT indigenous people by the Muslim Bengali settlers and express my heartfelt sympathy and solidarity to the victims.

Your Honorable, I would like to draw your serious attention towards these grievous incidents and demand the guarantee that such incidents do not reoccur. I also express my serious concern at the involvement of Bangladesh military personnel in the incidents.

I would also like to draw Your Honorable's serious attention and immediate action towards the following.

1. Provide adequate medical treatment and compensation to the victims.
2. Make immediate arrangements for rehabilitation of the molested girls.
3. Locate the missing Buddhist monk and allow him to preach his faith.
4. Evacuate and take severe punitive actions against the illegal settlers.
5. Return the titled land thus evacuated to the indigenous people.

Please accept, Your Honorable, the assurance of my highest consideration.

Yours sincerely,

Maheswor Shrestha
A member of the Newar indigenous nationality of Nepal
E-mail <m.shrestha@yahoo.com> Jawgal, Lalitpur-10, NEPAL

Press Conference on the barbaric attack upon the Jumma Buddhists and land grabbing by the Bengali Muslim Settlers in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh by Bangladesh Chittagong Hill Bhikkhu Sangha-Sri Lanka.

10th April 2006, Colombo, Sri Lanka.

Dear,

Distinguished reprehensive from media,

At the outset, I on behalf of the Bangladesh Chittagong Hill Bhikkhu Sangha –Sri Lanka (BCHBS-S), would like to extend my sincere thanks to all of you for your great support in making this press conference a success.

The episode is that on 3rd April 2006, the Bengali Muslim settlers led by Ahad Mian, member of the local union council, Bahar leader and Mohammad Abu, ex-UP member attacked on two Jumma Buddhist villagers-Nuapara and Joysenpara in Maischari in northern Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, and at least 50 innocent Jumma Buddhists in that attack have been injured and four Buddhist women have also been raped. According to local people, the night before the day of incident the Bengali Muslim settlers tried to occupy the land belonging to the Buddhist Children's House run by Ven. Sumana Mahathero, but they were repulsed. Again they at around 8.00am mobilizing more settlers from other areas led a barbaric attack on the innocent Jumma Buddhists. The Jumma Buddhists could not resist the attack as the Bengali Muslim settlers were more organized and equipped with lethal weapons and as a result Jumma Buddhists were in the receiving end. Though a military camp was adjacent to the place of the incident, however the military played a silent role completely. In fact, 4 years back the Bengali Muslim settlers nder patronage of government settled in the area of Buddhists Children's House grabbing the lands belonging to the Jumma Buddhists, Even a part of the land belonging to the Buddhist Children House was grabbed. No doubt that, the attack of 3rd April is pre-panned completely to grabb Jumma Buddhists land.

The Chittagong Hill Tract **(CHT)** in Bangladesh is the traditional homeland of 11 small indigenous groups who are collectively known as Jumma people. The majority of these people are Buddhist while some are either devout Hindus or practise Christianity.

For decades, the successive governments of Bangladesh have been engaged in implementing the policy of ethnic cleansing to efface the indigenous Jumma Buddhists from the map of the world. With a view to shifting the demographic balance and convert the Chittagong Hill Tracts into a Muslim majority area, the government of Bangladesh has transplanted more than 400,000 Bengali Muslim from the plain districts that under international law such population transfers constitute a war crime and are prohibited under Article 49 of the Fourth Geneva Convention. The settlers were settled on the land belonging to the Jumma Buddhists and due to such illegal settlement thousands of Jumma Buddhist lands were grabbed forcibly by the Bengali Muslim settlers. The area has also been turned into a virtual military cantonment with one-third of the country's security forces deployed in the name of preserving sovereignty and national integrity. Human rights violations have become the order of the day. Genocide after genocide has been committed on the Jumma Buddhists with total impunity and outside the gaze of the international community. The ethnic cleansing policy of the government also resulted in mass exodus of Jumma Buddhist refugees into Indian state of Tripura in 1986 and 1989. So far, military and Bengali Muslim settler together have been committing massacre, arson, land grabbing, rape, looting, destroying Buddhist temple, harassing Buddhist monks etc.

On 2 December1997, a Accord which known as "Peace Accord" was signed between the government of Bangladesh and the Jana Samhati Samiti (JSS), a political party of the Jumma people. The "Peace Accord" is said to have been signed to resolve the decades old Chittagong Hill Tracts problems. However after over 8 years the government did not implement the "Peace Accord" and the Chittagong Hill Tracts problem remains where it was before. The military is still there in full strength. And not only have the Bengali Muslim settlers not been withdrawn from CHT, they are also trickling into the CHT. Human rights violations in the form of unlawful arrest and detention, murder, military raids, kidnappings, disappearances, arson, looting, rape, land grabbing, religious persecution are still being committed against the Jumma Buddhists. Such as - on 26 August 2003, military and Bengali settlers burnt down a Buddhist temple and tortured monks during an attack on 10 Jumma villages in Mahalchari in Khagrachari district that left 500 houses burned, 2 Jumma Buddhist killed and 10 women raped. The attackers also broke the statue of the Lord Buddha.

I, have no intention to provide a detailed account of the incidents of human rights violations or to cite exhaustive evidence in support of the claim that ethnic cleansing policy of the government of Bangladesh is still in force in the CHT. To do so would entail a great deal of time and space. These are just snap shots of what is happening in the CHT.

Appeal to international community:

Therefore, we appeal to the government and the people of Sri Lanka, including journalists, human rights groups, and members of parliament and other prominent individuals, to put pressure upon the government of Bangladesh to safeguard the identity of the Jumma Buddhists, to immediately stop human rights violations, to withdraw the military and Bengali Muslim settlers from CHT. We appeal to the human rights organizations to send a fact finding mission to the Chittagong Hill Tracts to assess the human rights situation in the area.

Appeal to government of Bangladesh:

We strongly condemn gross human rights violations in the CHT including the recent barbaric attack on the Jumma Buddhists and land grabbing by the Bengali Muslim settlers. We, strongly demand exemplary punishment to those responsible for the attack and land grabbing, compensation to the victims, to stop human rights violations in CHT

Appeal to the media persons:

Finally, we would like to appeal to the media persons to help us to carry our message to the authority of Bangladesh as well as to the international communities through your esteemed dailies.

Thank you.

Bangladesh Chittagong Hill Bhikkhu Sangha- SriLanka

Head Office & Correspondent Address: Ashokaramaya, Thimbirigasyaya, Colombo 05
Tel: 0776426834

Letter from Survival International, London, UK

11 April 2005

Her Excellency Begum Khaleda Zia

Office of the Prime Minister
Gona Bhaban, Sher-e Bangla Nagar
Dhaka, Bangladesh

Your Excellency,

Survival International was extremely shocked to learn of the attacks by Bengali settlers against Jumma villagers in Saprue Karbari Para, Nua Para and Chakra Para the in Mahalchari sub-district of Khagrachari Hill District on 3 April 2006.

Two Jumma women were raped and around fifty Jumma people injured in the attacks, which appear to have been carried out with the support of local police. The attacks were sparked by a conflict over land, in which Bengali settlers tried to grab land belonging to the Jumma people. Most of the families from the three villages have fled their homes.

I urge you to ensure that this incident is investigated fully and that those responsible for the attacks are brought to justice. I also urge you to prevent further land-grabbing, to return to the Jumma peoples the land that has been stolen from them, and to end the military occupation of the Chittagong Hill Tracts. The promises made to the Jumma peoples in the 1997 Peace Accords must be fulfilled so that the Jummas can live safely on their own land.

Yours sincerely,

Stephen Corry

Director

cc. Mr. Moni Swapan Dewan, Honorable Deputy Minister, Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs

Mr. Sabihuddin Ahmed, Bangladesh High Commissioner to the UK

We help tribal peoples defend their lives, protect their lands and determine their own futures.

Survival International
6 Charterhouse Buildings
London EC1M 7ET, UK
Tel: 020 7687 8700, Fax: 020 7687 8701
http://www.survival-international.org

Letter from Jumma Net of Japan with signature of 27 organizations and 253 individuals around the world

12 April 2006

Begum Khaleda Zia
Honorable Prime Minister
Government of the People's Republic of Bangladesh

Your Excellency,

We are writing to express our serious concern regarding the violent attack perpetrated by Bengali settlers against the indigenous inhabitants of Sa Prue Para, Joysen Para, Chakra Karbari Para and Nua Para villages in Mahalchari sub-district of Khagrachari Hill District on 3 April 2006. We are deeply shocked and angered to learn that two young Marma women were cruelly gang raped by the settlers. A Buddhist orphanage and many homes were ransacked, and some 30 indigenous people were injured, several of them critically, in the settlers' attempt to grab land. It is particularly disturbing to note that the personnel of the Nuapara Arms Police Battalion Camp, located only about 200 yards from the area of the incident, did nothing to stop the attack, and were seen at the scene of the crime.

This incident has occurred in the context of intensified illegal grabbing of indigenous peoples' lands by Bengali settlers in the region:

- More than 115 houses have been built on some 100 acres of titled indigenous land in the nearby Gamaridhala area, allegedly with the assistance and protection of local military forces. Promises by military authorities to withdraw the houses remain unimplemented.
- The Buddha Shishu Ghar orphanage has lost almost all of its titled land to illegal land grabbing.
- On March 4th, several indigenous residents involved in non-violent protests against this land grabbing were severely beaten and arrested by army personnel. The next day, military barged into the Khagrachari court, escorted two of them outside, placed firearms in their hands and took false photos of them. They remain in police custody, facing false charges of illegal weapons possession.

How can Bangladesh seek a seat on the UN Human Rights Council when its own human rights situation is in such disorder? How long must the indigenous peoples of the Chittagong Hill Tracts suffer in silence as they are robbed of their lands, lives, and dignity with total impunity, under the very noses of the security forces purportedly there to protect them? Must Bangladesh repeat the crimes that the white men perpetrated against the indigenous peoples of the Americas, or the Japanese against the Ainu people? Should not a nation that fought so nobly to safeguard its own language and identity, also respect the wishes of indigenous peoples to maintain their own way of life?

We strongly urge the government to immediately take the following actions to correct the injustices of this heinous incident:

1. bring to justice the perpetrators of the 3 April communal attack particularly those involved in the rape incident
2. provide free treatment to the injured, compensation for damages, and protection from any further violence or land grabbing.
3. investigate the role of Nuapara arms police battalion in the 3 April incident, and the military authorities in land grabbing in the Gamaridhala area. Take disciplinary/legal action against personnel derelict in fulfilling their duties or responsible for aiding/abetting illegal activities.
4. remove the new houses built by Bengali settlers on disputed lands in Gamaridhala, and return the land to the indigenous land owners.
5. release the indigenous people arrested on March 4th and withdraw the false cases against them.

We shall bring the above issues to the attention of our government, particularly the authorities in charge of official development assistance. Your inaction on these matters will not go unnoticed.

Sincerely yours,

Takashi Shimosawa,
President,Jumma Net
5F Marukou Bldg., 1-20-6 Higashi Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015, Tel/Fax: 03-3831-1072
E-mail: office@jumma.sytes.net

Letter from United Jumma International, Sydney, Australia

May 7, 2006,

To
Mr. John Howard
Hon'ble Prime Minister of Australia
Kirribilli House, Kirribilli,
NSW 2061,
AUSTRALIA.

Subject: **An Appeal to save the Jumma Nation in the Chittangong Hill Tracts (CHT) of Bangladesh**.

Dear Hon'ble Prime Minister,

The United Jumma International (UJI) draw your kind attention that the systematic Human Right Violation against the Indignous Jumma Nation in CHT are continued even after the CHT Peace Accord in 1997.

On 3rd April 2006, five Jumma villages and a Orphanage school under the Maischari Union, Khagrachari Hill District CHT, was attacked by the Bengali Muslim settlers and Islamic Fundamentalists with full backing by the Bangladesh Army. As a result, 11 jummas was seriously injured, more than 50 minor injured including a Buddhist monk name Ven. Sumana Mahathera, Director of Orphanage School and 2 women were gang ragped by the Islamic Fundamentalists. About 100 Jumma houses were burnt down, looted and destroyed including the Orphanges School.

The CHT is the south-eastern part of Bangladesh, which is the traditional Homeland of the Jumma Nation. Since creation of Pakistan in 14th August 1947,the Pakistani govt. had pursued hostile policy toward the Jumma people. Even after the Independence of Bangladesh in 1971, the same policy been accelerated to eradicate the Jumma people in CHT.

As a part of the said policy of the government of Bangladesh (GOB) patronized the program to migration of 6-7 millions Bengali Muslim to change the demographic position of Jumma population in CHT. On the otherhand, the GOB set up military installations, Army, para-military and police forces to commit massive atrocities including massacres against the Jumma people.

Since 1971, the government lauched undeclared war against the Jumma people for their total extermination. As a consequence to it, approximately 35,000 jummas lost their life; 500, 000 jummas were internally displace and 80,000 jummas were compelled to take refugee in Tripura and Mizoram states in India. With an aim to uproot

the Jumma people from their ancestral land, a long series of massacres and genocide were perpetrated by the Bengali Muslim settlers with the direct help of army, Ansar, APBN (Armed Police Battalion) and VDP(Village Defense Party). As such it left a horrible legacy of violence, rape loot, murder, arson, abduction, religious persecution, and forcible occupation of jumma land and property as well as gross violation of human rights for more than two decades.

As per as reports, since 1971-97, more than 15 massacres and 10 communal riots had been committed in CHT by the Muslim Settlers with backing of Bangladesh army.

The UJI, aware of the humanitarian aspect of the aid given to Bangladesh by Australia Governmnet's aid plan in which it states; "support is needed to address the issues in CHT with the population of ethnic minorities".

Therefore, We on behalf of UJI would like to appeal you to stop further aid given to Bangladesh government unless the following conditions are meet:-

- Implement the CHT Peace Accord 1997 fully and properly;
- Rehabilitate Muslim settlers and Islamic Fundamentalists outside the CHT Region as per as Peace Accord;
- Demilitarize in the CHT Region and withdrawl all "temporary para-military camps" and de facto military rule ' Operation Uttaran', as per as Peace Accord;
- Rehabilitate all Jumma returnee refugees according to Peace Agreement.
- Rehabilitate the Jumma affected families in the recent communal attacked and give proper conpensations; and
- Government of Bangladesh should bring all perpetrators to Juslice.

Yours Sincerely,

(Ven. Pragya Jyoti)
President
United Jumma International
Sydney, Australia

(Mr. Bishwajit Chakma)
General Secretary
United Jumma International
Sydney, Australia

P.O. Box. Q470, QVB Post Office, Sydney, NSW 1230, AUSTRALIA
Tel: 61-2-9518 1541; Mobile: 61-04 1747 3618
E-mail: bhante_international@yahoo.com.au

বিশেষ প্রতিবেদন

জনসংহতি সমিতির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জোরদার করুন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২-৪ মার্চ ২০০৬ তিনদিন ব্যাপী রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বালুখালী ইউনিয়নের কিল্যামুড়াস্থ বেসরকারী পর্যটন কেন্দ্র টুকটুক ইকো ভিলেজে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৮ম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শাখাসমূহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ও গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর আড়াই শতাধিক প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক যোগদান করেন। জাতীয় সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট ৯ম কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি পদে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, সহ সভাপতি পদে শ্রী লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা, সাধারণ সম্পাদক পদে শ্রী সত্যবীর দেওয়ান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে শ্রী শক্তিপদ ত্রিপুরা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। সম্মেলন শেষে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনে বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এরপর উপস্থাপিত সামগ্রিক প্রতিবেদনসহ জাতীয় সম্মেলনে আন্তর্জাতিক, বাংলাদেশ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনসহ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা, পার্টির সাংগঠনিক অবস্থা, পার্টির ভবিষ্যত কর্মপন্থার উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় সম্মেলনেরর উদ্বোধনী পর্ব

সম্মেলনে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, সারা বিশ্বের পরিস্থিতি ক্রমাগত চরম সংকটের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিশ্বে দেশে দেশে চরম বেকারত্ব, দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ শিল্পোন্নত দেশসমূহেও বেকারত্ব বেড়ে চলেছে। দারিদ্র, ক্ষুধা ও রোগে-শোকে প্রতি বছর কোটি কোটি মানুষের জীবনহানি ঘটছে। দেশে দেশে বেকারত্ব, দারিদ্র ও ক্ষুধা, জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি সংকটের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে।

দেশের রাজনীতিতে চলছে চরম অরাজকতা ও নৈরাজ্য। দলীয়করণ, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন দেশের রাজনীতিতে প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন ব্যবস্থা, পুলিশ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে দেশের কোন কিছুই বাদ যায়নি এই দলীয়করণ ও দুর্বৃত্তায়নের কালো থাবা থেকে। তারই ফলশ্রুতিতে জাতীয় সংসদ আজ অচল হয়ে পড়েছে। নব্বই-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর একটা আশাবাদ জাগ্রত হলেও গণবিরোধী রাজনৈতিক চর্চার কারণে দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ধারা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে। গণতন্ত্র এখন কালো টাকা ও পেশীশক্তির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের অভাব তথা গণতান্ত্রিক সুশাসনের অভাবের কারণে প্রতিটি মানুষের জীবন ও সম্পদ আজ চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বিরাজ করছে। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের পরিবর্তে দলীয় মনোনয়ন ব্যবস্থার ফলে নারী সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করা হয়েছে। সারা দেশে আজ উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও ইসলামী জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এসব জঙ্গিগোষ্ঠীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী, বিচারক, আইনজীবী, পুলিশ, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসহ গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের উপর আঘাত হানছে। তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আজ চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। অপরাধ, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, খুন-জখম, নারী পাচার, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি আজ জনজীবনকে বিষিয়ে তুলেছে।

অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর দেশের শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত নির্মূলীকরণের কার্যক্রম অধিকতর জোরদার হয়ে উঠেছে। জাতিগত নির্মূলীকরণের লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠী সেনাশাসন, উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী তৎপরতা, বহিরাগত অনুপ্রবেশ, জুম্মদের ভূমি জবরদখল, সর্বোপরি জুম্মদের মধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতায় মদদদানের কার্যক্রম জোরদার করেছে। বিশেষ করে সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ' জারীর মাধ্যমে সেনাবাহিনীর হাতে অবাধ ক্ষমতা অর্পণ করতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে এই জাতিগত নির্মূলীকরণ কার্যক্রম উলঙ্গভাবে বাস্তবায়িত করা হয়ে আসছে। 'অপারেশন

উত্তরণ'এর বদৌলতে সেনাবাহিনী পূর্বের মতো সাধারণ প্রশাসনের উপর কর্তৃত্ব, অবাধে তল্লাসী অভিযান, ধর-পাকড়, বিচার-বহির্ভূত হত্যা ইত্যাদি স্বৈরতান্ত্রিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্র উদ্ধারের নামে নিরীহ গ্রামবাসীদের মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেল-হাজতে প্রেরণ ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহতভাবে চালিয়ে চলেছে।

জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে বহিরাগত মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠী সেনাবাহিনী ও সিভিল প্রশাসনের মাধ্যমে অত্যন্ত সুক্ষ্ম পরিকল্পনাধীনে বহিরাগত বাঙালী অনুপ্রবেশ ও বসতি প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। এলক্ষ্যে ২৮ ডিসেম্বর ২০০৫ জামায়াতে ইসলামীর সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কয়েকজন সদস্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রাম সফরের মাধ্যমে বসতিপ্রদানকারী ২৮ হাজার বহিরাগত বাঙালী পরিবারকে বিনামূল্যে রেশন প্রদানের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। সাজেক এলাকায় ১০ হাজার বহিরাগত বাঙালী পরিবার বসতি প্রদানের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীরা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বান্দরবান জেলায় নাইক্ষ্যংছড়ি, রুমা, লামা, আলিকদম ও সদর উপজেলায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করছে। তারা ভোটার তালিকাভূক্ত হচ্ছে এবং স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র নিয়ে নানা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে চলেছে। সরকার পূর্বের মতো এবারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে বহিরাগতদের অন্তর্ভূক্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করেছে।

ভূমি থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের লক্ষ্যে জুম্মদের ভূমি জবরদখলের কার্যক্রম সর্বগ্রাসী রূপ লাভ করেছে। সেনাবাহিনী ও সিভিল প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জবরদখল, বন বিভাগের তথাকথিত বনায়ন কর্মসূচী ও রক্ষিত বন ঘোষণা, সশস্ত্রবাহিনীর সেনাছাউনি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণ, রাবার প্লানটেশনসহ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বহিরাগতদের নিকট দীর্ঘমেয়াদী ইজারা প্রদান, তথাকথিত ইকো-পার্ক ও অভয়ারণ্য স্থাপন, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে জুম্মদের চিরায়ত জায়গা-জমি জবরদখল করা হচ্ছে। এর ফলে শত শত জুম্ম পরিবার নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে এবং নিজ দেশে পরবাসীর মতো জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল নিয়ে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি, আলিকদম ও লামা উপজেলা; খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, দীঘিনালা এবং রাঙ্গামাটি জেলার বরকল, নানিয়ারচর ও কাউখালী উপজেলায় বর্তমানে প্রতিনিয়ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অপরদিকে বহিরাগতদের নিকট ইজারা প্রদান এবং রক্ষিত বন ঘোষণার ফলে জুম্ম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকতর পশ্চাদপদ ও স্বল্প জনসংখ্যা সম্পন্ন ম্রো ও খিয়াং জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। বর্তমান সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি অব্যাহত রাখার হীনস্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অস্থিতিশীল অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এলক্ষ্যে ইউপিডিএফ নামধারী একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে যেতে মদদ দেয়া হচ্ছে। পূর্বের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকর না হওয়ার কারণে উন্নয়ন কার্যক্রমে যেমনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা গড়ে উঠেনি তেমনি গণমুখী ও পরিবেশমুখী উন্নয়ন ধারা সৃষ্টি হতে পারেনি। ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন না করার ফলে তারা দুর্বিষহ মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। দেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি ও কালক্ষেপণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে আবারও জটিলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জিইয়ে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। বিগত সময়েই প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশের একটি বৃহৎ অংশে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে দমন-পীড়ন নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে; সর্বোপরি সেনাশাসন বলবৎ রাখার কারণে বরাবরই দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী নীতি বলবৎ রাখার কারণে আজ সারাদেশে ভয়াবহ রূপ নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় জঙ্গিপনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো নিরাপদ আস্তানা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনা-পর্যালোচনার পর বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়-

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করা।
২) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন এবং প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, আইন-শৃঙ্খলা ও পুলিশ (স্থানীয়)সহ পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরযোগ্য বিষয়সমূহ কার্যকর করা।

৪) স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে আগামী সংসদ নির্বাচনসহ সকল স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীসহ অন্যান্য অস্থায়ী বাসিন্দাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন পূর্বক ভূমি কমিশন গঠনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬) কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত স্থায়ী বাঙ্গালীদের পুনর্বাসনসহ প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা।

৭) 'অপারেশন উত্তরণ' নামক সেনাশাসন বাতিল পূর্বক সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি'র সকল অস্থায়ী ক্যাম্প চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাহার করা।

৮) চুক্তি ও আইন লঙ্ঘন করে তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকদের নিকট স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের অর্পিত ক্ষমতা বাতিল করার দাবী জোরদার করা।

৯) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়নসহ পরিষদসমূহ কার্যকর করা।

১০) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও পরিষদীয় প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা।

১১) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যক কোটা সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১২) নারী মুক্তি আন্দোলন জোরদার করা এবং সমাজ উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে মহিলাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিকতর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৩) সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত ও দক্ষিণপন্থী দুলাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করা।

১৪) দেশের অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে ইস্যু ভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যক্রমে সামিল হওয়া।

১৫) বহিরাগত সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে যথাযথ ও সম্মানজনক পুনর্বাসনের জন্য প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৬) ইউপিডিএফ সহ সকল চুক্তি বিরোধী চক্রান্তকারীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা কঠোরভাবে মোকাবেলা ও নির্মূল করা।

১৭) পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ ব্যাপকভাবে ধ্বংস সাধন রোধকল্পে আন্দোলন জোরদার করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরনে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করার উপর প্রাধান্য দেয়া।

১৮) স্থায়ী পাহাড়ী-বাঙ্গালী জনগণের উপর অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার করা।

১৯) পাহাড়ী-বাঙ্গালী স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য সংহতি জোরদার করা।

২০) পার্বত্য চট্টগ্রামের গরীব ও বেকার যুবক-যুবতীদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২১) জুমচাষী ও ফরেষ্ট ভিলেজারদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের উপর গুরুত্বারোপ করা।

২২) কাপ্তাই বাঁধের মৌসুম অনুযায়ী বাস্তবসম্মতভাবে জলসীমা নির্ধারণ করা এবং কাপ্তাই হ্রদের জল সম্পদ সুষ্ঠ ব্যবহারে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জুম্ম জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা বিস্তার ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্থ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করা।

২৫) অবৈধভাবে ভূমি অধিগ্রহণ, লিজ ও বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখা।

২৬) বন বিভাগ কর্তৃক বনায়নের নামে অবৈধভাবে অধিগ্রহণকৃত স্থায়ী বাসিন্দাদের জমি উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৭) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার উপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২৮) মাদকাসক্তি, ড্রাগ, জুয়া ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপসহ অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অধিকতরভাবে রুখে দাঁড়ানোর কার্যক্রম জোরদার করা।

২৯) তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় পুলিশবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে পাহাড়ী পুলিশ কর্মকর্তা ও কনষ্টেবলদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলীর দাবী জোরদার করা।

৩০) পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের স্বার্থ পরিপন্থী যে কোন এনজিও কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিরোধিতা করা।

৩১) বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে অধিকতরভাবে অংশগ্রহণ করা।

৩২) বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অধিকতরভাবে সামিল হওয়া।

৩৩) কৃষক, জুমচাষী, মৎস্যজীবীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের অধিকতর সংগঠিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩৪) দেশে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও গণমুখী সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অধিকতর সামিল হওয়া।

৩৫) পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় জঙ্গিবাদী তৎপরতা প্রতিরোধে অধিকতর ভূমিকা পালন করা।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জবরদখল অব্যাহতভাবে চলছে

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হবার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি দিন দিন অবনতি হচ্ছে এবং উদ্বেগজনক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ এবং ২৮,০০০ পরিবারকে রেশন তালিকাভূক্তিকরণ ও ১০,০০০ পরিবারকে সাজেক এলাকায় বসতি প্রদানের অব্যাহত সরকারী ষড়যন্ত্রের ফলে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় বহিরাগতদের অন্তর্ভূক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এর ফলে ক্রমবর্ধমানহারে বহিরাগত অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং তাদের দ্বারা ভূমি বেদখল অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিম্নে ভূমি জবরদখলের সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা গেল-

বাঘাইছড়িতে জোরপূর্বক দস্তখত নিয়ে এক জুম্মর ভূমি মালিকানা কেড়ে নিল পুলিশ ও বনবিভাগ

গত ১০ মার্চ ২০০৬ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা মোঃ জাহেদুল কবির বাঘাইহাট পুলিশ ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নুর ইসলামের সহযোগিতায় জোরপূর্বক সাদা কাগজে দস্তখত নিয়ে বনবিভাগের নামে লিখে নিল বাঘাইছড়ি উপজেলার ডানে বাইবাছড়া এলাকার অমল কান্তি চাকমা ওরফে বরপেদা (৩৬) পীং প্রয়াত কুমুদ রঞ্জন চাকমা নামের এক গ্রামবাসীর ভোগদখলকৃত নিজস্ব জমি। অথচ দীর্ঘদিন ধরে অমল কান্তি চাকমা তার এই জমি চাষাবাদ ও ভোগদখল করে জীবনধারণ করে আসছিল।

মাটিরাঙ্গায় সেনা কমান্ডারের সহায়তায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি জবরদখল

গত ২৭ এপ্রিল ২০০৬ মোঃ রফিকুল ইসলাম নামের এক সেটেলার বাঙালী স্থানীয় সেনাক্যাম্প কমান্ডারের সহায়তায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ভক্ত কার্বারী পাড়া গ্রামের সঞ্জীব চাকমা, পীং ভালুক্যা চাকমা নামের এক জুম্ম গ্রামবাসীর ৫ একর পরিমাণ বাগান ভূমি বেদখল করেছে। জানা যায়, ঐদিন মোঃ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল সেটেলার বাঙালী উক্ত সঞ্জীব চাকমার ভূমি জোরপূর্বক দখল করে। উল্লেখ্য, এর পূর্বে মাটিরাঙ্গা সেনা জোনের ক্যাপ্টেন বাবর ভক্ত কার্বারী পাড়া এলাকার বাসিন্দাদের ডেকে এক জনসভার আয়োজন করে এবং তথাকথিত রফিকুল ইসলামের ভূমি ছেড়ে দেয়ার জন্য ভক্ত কার্বারী পাড়ার জুম্মদের নোটিশ দেয়। এ সময় ক্যাপ্টেন উল্লেখ করে যে, সঞ্জীব চাকমা রফিকুল ইসলামের ভূমি বেদখল করেছিল। এভাবে উক্ত সেটেলার বাঙালীরা পাশ্ববর্তী জুম্মদের অনেক ভূমি বেদখল করে আসছিল বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছে।

লংগদুর বগাচদর ও ভাসন্যা আদামে সেটেলার বাঙালীরা জুম্মদের রেকর্ডীয় ও দখলীয় পাহাড় ভূমি বেদখল করছে

বর্তমানে লংগদু উপজেলাধীন বগাচদর ও ভাসন্যা আদাম ইউনিয়নে জুম্মদের রেকর্ডীয় ও দখলীয় পাহাড় ভূমি বেদখল করছে অনুপ্রবেশকারী বাঙালীরা। ভূমি জবরদখলের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে আপত্তি, এমনকি থানায় মামলা করেও প্রশাসনের তরফ থেকে কোন বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। নিম্নে ভূমি জবরদখলের কয়েক ঘটনা উলেখ করা হল-

১। তড়িৎ কান্তি চাকমা (কার্বারী) পীং সুষমা রঞ্জন চাকমা, সাং মহাজন পাড়া, ৪নং বগাচদর ইউনিয়ন, ১১নং পেদান্যামা ছড়া মৌজা, থানা লংগদু, জেলা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আর-৬২ হোল্ডিং-এর ৩ (তিন) একর পাহাড় ভূমি জোরপূর্বক বেদখল করছে লংগদুর ঠেকা পাড়ার (১) মোঃ বাবুল পিতা আজিক উদ্দীন শেখ ও (২) শুক্কর আলী পিতা মনোহর আলী।
২। লংগদু উপজেলার ভাসন্যা আদাম ইউনিয়নের বাসিন্দা শান্তি লাল চাকমা (৪৫) পীং লাঙ্গ চাকমা। তিনি ৫ (পাঁচ) একর ভোগদখলীয় ভূমিতে ৬০০টি কলা চারা রোপন করেছেন; প্রতিবিন্দু চাকমা (২৮) পীং লাঙ্গ চাকমা। তিনি নিজ ভোগদখলীয় ৬ (ছয়) একর জায়গাতে ১২০০টি কলা চারা রোপন করেছেন; এবং শ্যামল চাকমা পীং বিক্রম কেশর চাকমা। তিনি নিজ ভোগদখলীয় ৩ (তিন) একর পাহাড় ভূমিতে ৫০০টি কলা চারা রোপন করেছেন। উলেখিত তিনজন জুম্মকে উচ্ছেদ করে জোরপূর্বক পাহাড় ও ক্ষেত বেদখল করে ভাসন্যা আদাম ইউনিয়নে বসতিকারী (১) মো: মোলা লিডার পিতা অজ্ঞাত ও (২) মোঃ মোতালেব পিতা নায়ালক। জুম্মরা অত্যন্ত গরীব। বর্তমানে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারায় সেটেলার কর্তৃক পাহাড়ীদের ভূমি জবরদখল

খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা থানাধীন গুইমারা মৌজার ভক্তপাড়া গ্রামের কৈতরছড়ায় সেটেলার বাঙালী লিডার মুখলেশ লিডার ও মাহফুজ-এর নেতৃত্বে পাহাড়ীদের ভূমি বেখর করে নিয়ে ঘরবাড়ী তুলেছে। পাহাড়ীরা এর প্রতিবাদ করলেও কোন বিচার পায়নি।

দীর্ঘ দিন ধরে মুখলেশ লিডার কৈতরছড়ায় ভূমি বেদখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার গঠনের পর মুখলেশ লিডার একা কৈতরছড়ায় বিশাল ভূমি বেদখল করে ঘরবাড়ী তুলে বসবাস করছে। এ সকল জায়গা পাহাড়ীদের ভোগদখলীয় ভূমি/টিলা ছিল। এরপর ক্ষমতাসীন দলের এমপি ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সাথে যোগাযোগ করে পঞ্চাশ পরিবার সেটেলার বাঙালী কৈতরছড়ায় নেয়ার জন্য চেষ্টা করে। সর্বশেষ পঁচিশ পরিবার সেটেলার বাঙালী কৈতরছড়ায় নেয়ার জন্য ওয়াদুদ ভূঁইয়া সহযোগিতার আশ্বাস দিলে ভূমি জবরদখলের প্রক্রিয়া শুরু হয়। অব্যাহত ভূমি জবরদখলের বিরুদ্ধে পাহাড়ীরা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করলে গুইমারা থানায় পাহাড়ীদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। পরবর্তীতে গুইমারা সেনা জোনে বিচারের জন্য মুখলেশ লিডার দরখাস্ত করলে জোন কম্যানন্ডার নুরুল হুদা পাহাড়ীদেরকে ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে যায়। গত ২৯ মার্চ ২০০৬ মাটিরাঙ্গা জোনে বিচার অনুষ্ঠিত হয়। বিচারে উপস্থিত ছিলেন- গুইমারা থানার ওসি, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য মনিন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা, গুইমারা মৌজার হেডম্যান রিপ্রুচাই চৌধুরী, কৈতরছড়ার ভক্তপাড়ার কার্বারী ভক্ত চাকমা, সেটেলার মুখলেশ লিডার, সেটেলার মাহফুজ পিতা আব্দুল আলীম, মাটিরাঙ্গা সেনা জোনের কম্যান্ডিং অফিসার নুরুল হুদা, গুইমারা ইউপি চেয়ারম্যান নগেন্দ্র নারায়ণ ত্রিপুরা, হাতুং পাড়ার কার্বারী হিরন ত্রিপুরা প্রমুখ ব্যক্তি।

উক্ত সভায় বাঙালী সেটেলাররা পাহাড়ীদেরকে দোষারোপ করে ঘরবাড়ী ভাঙার ও ভূমি দখলের অভিযোগ করলে মনিন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা তার প্রতিবাদ জানিয়ে পাল্টা সেটেলারদেরকে ভূমি বেদখলের অভিযোগে অভিযুক্ত করে বক্তব্য দিলে উভয়পক্ষ গুইমারা ইউপি চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত ও রায়ের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে গত ৪ এপ্রিল ২০০৬ দুপুর ১২টায় চেয়ারম্যানের বাসভবন বাল্যাছড়ি গ্রামে সভা বসে। এতে সমঅধিকার আন্দোলনের নেতা ও বিএনপি মাটিরাঙ্গা থানা শাখার সভাপতি আবু ইউসুফ, গুইমারা ইউনিয়নের সদস্য আহম্মদ কবির, সেটেলার মুখলেশ লিডার, মাহফুজসহ অন্যান্য সমঅধিকার আন্দোলনের নেতারা বিচারে উস্থিত হয়ে ঐ এলাকায় পাহাড়ীদের কোন জমি/ভূমি নেই বলে উলেখ করে একতরফা সিদ্ধান্ত আদায় করে এবং পাহাড়ীদের থেকে জোরপূর্বক দস্তখত নেয়। এরপর থেকে বাঙালরিা ভূমি বেদখল করে ঘরবাড়ী তুলতে শুরু করে।

যাদের ভূমি বেদখল করা হয়েছে তারা হলেন- (১) কান্তি চাকমা পিতা ভক্ত চাকমা, (২) সিয়াধন চাকমা পিতা মৃত চেপদা চাকমা, (৩) কুমা রঞ্জন ত্রিপুরা পিতা শিব চরন ত্রিপুরা, (৪) অজিত ত্রিপুরা পিতা কুন্তি চন্দ্র ত্রিপুরা ও (৫) প্রিয় লাল চাকমা পিতা অজ্ঞাত প্রমুখ ৫ জন জুম্ম গ্রামবাসী। তাদের প্রত্যেকের ৫ একর করে বন্দোবস্তীকৃত ও ভোগ দখলীয় ভূমি রয়েছে।

রামগড়ে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের জায়গা জবরদখল চলছে

অতি সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার রুপাইছড়ি গ্রামের খর্গ চন্দ্র ত্রিপুরা পিতা মৃত রায়ধন ত্রিপুরার জমি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থেকে বসতিকারী মোঃ আব্দুল কবির পিতা অজ্ঞাত জবরদখল করেছে। মোঃ আব্দুল কবির বর্তমানে রামগড় সদরে অবস্থান করে।

বিবরণে জানা যায়, বেদখলকারী বর্তমানে জায়গার মালিক দাবী করে প্রকৃত মালিকের ৫ একর ফলজ জমি বেদখলে নেয়ার জন্য জোর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাগান হতে ইচ্ছামতো বাঁশ-গাছ কেটে নিয়ে ভোগ করছে। এ ব্যাপারে খর্গ চন্দ্র ত্রিপুরা রামগড় বিডিআর জোনে এর প্রতিকার চেয়ে আপত্তি করে। ইতিপূর্বেও বেলাল নামে জনৈক এক সেটেলার জায়গার মালিক দাবী করে বাগানের গাছ-বাঁশ কেটে নিয়ে যায়। খর্গ চন্দ্র ত্রিপুরা জেলা প্রশাসক বরাবরে আপত্তি করলে জেলা প্রশাসক রামগড় থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ প্রদান করেন। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা কানুনগোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করে রিপোর্ট করতে বললে কানুনগো ২৭ জুন ২০০৬ নোটিশ ইস্যু করেন। এতে ৭ জুলাই ২০০৬ উভয় পক্ষকে নিজ নিজ পক্ষে কাগজপত্র নিয়ে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়। কানুনগো বিতর্কিত জমিতে না গিয়ে খাগড়াবিল বাজার পর্যন্ত গিয়ে কারো মতামত না নিয়ে ফিরে যান।

এভাবেই বর্তমানে রামগড় উপজেলায় সেটেলার বাঙালীরা প্রশাসনের ছত্রছায়ায় জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জায়গা-জমি জবরদখল করে চলেছে। নিম্নে ভূমি জবরদখলের কিছু তথ্য দেয়া গেল-

নাভাঙ্গা মৌজা ও সেম্প্রু মৌজার তবলা নোয়া পাড়া গ্রামে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের জায়গা জবরদখল

নং	জমি মালিকের নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	জায়গার পরিমান	বেদখলকারী সেটেলারদের নাম	ঠিকানা
১	মংমং মার্মা	সুজি মার্মা	তবলা নোয়াপাড়া	৫ একর	মো: আকাছ আলী	জালিয়া পাড়া, রামগড়
২	সাজাই মার্মা	আম্রা মার্মা	ঐ	৫ একর	মো: আমান আলী	ঐ
৩	মংথোয়াই মার্মা	আহলু মার্মা	ঐ	৫ একর	কালামিয়া	ঐ

৪	থোয়াইংথ্রু মার্মা	দোঅংগ্য মার্মা	ঐ	৫ একর	কালামিয়া	ঐ
৫	সাথৈথ্রু মার্মা	আহলু মার্মা	ঐ	৫ একর	কালামিয়া	ঐ
৬	মংথ্রু মার্মা	আহাং মার্মা	ঐ	৫ একর	সিরাজ মিয়া	ঐ
৭	মিয়ামং মার্মা	মংমং মার্মা	ঐ	৫ একর	কাজী নজরুল ইসলাম	ঐ
৮	সাথোইথ্রু মার্মা	অংসু মার্মা	নোয়াপাড়া	৫ একর	মতিয়ার রহমান	ঐ
৯	মংসানাই মার্মা	মংশে মার্মা	ঐ	৫ একর	আশ্রাদ আলী	ঐ
১০	উহা মার্মা	বুমিচাই মার্মা	তবলা	৫ একর	শাহ আলম	ঐ
১১	অংগ্য মার্মা	হ্লাদা মার্মা	ঐ	৫ একর	মারফত উলা	ঐ
১২	বাহা মার্মা	কংজরী মার্মা	ঐ	৫ একর	শাহ আলম	ঐ
১৩	মংজাই মার্মা	বাইশে মার্মা	ঐ	৫ একর	মতিয়ার রহমান	ঐ
১৪	থুইহ্লাথ্রু মার্মা	থৈথ্রু মার্মা	ঐ	৫ একর	মো: ইদ্রিছ মিয়া	ঐ

২নং পাতাছড়া ইউনিয়নের পাইল্যা ভাঙা গ্রামের পাহাড়ীদের জায়গা সেটেলার বাঙালী কর্তৃক বেদখল

নং	জমি মালিকের নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	জমির পরিমাণ	সেটেলারদের নাম	ঠিকানা
১	হ্লাওয়ং মার্মা	উথোয়াই মার্মা	পাইল্যা ভাঙা	৫ একর	মো: সেলিম	বর্তমানে পাতাছড়া
২	হ্লাচাইং মার্মা	মংমংশি মার্মা	ঐ	ঐ	পিসি রুহুল আমিন	ঐ
৩	সাথ্রু মার্মা	কংচাই মার্মা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪	মাংতু মার্মা	সাথ্রু মার্মা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫	উগ্যজাই মার্মা	হ্লাফাঅং মার্মা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় কর্তৃক রাঙ্গামাটিতে ভূমি বিষয়ক কর্মশালা বন্ধ

গত ২৩ নভেম্বর ২০০৫ রাঙ্গামাটিতে আয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি অধিকার শীর্ষক দু' দিনব্যাপী এক কর্মশালা বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। রয়াল ড্যানিশ এ্যামবাসী তথা ডানিডার মানবাধিকার ও সুশাসন-প্রোগ্রাম সাপোর্ট ইউনিটের সহায়তায় ২৩ ও ২৪ নভেম্বর ২০০৫ দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালা আয়োজন করে হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম, কাপেং, ম্রোচেট, বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন, মালেয়্যা ও টংগ্যা। দু' দিন ব্যাপী এই কর্মশালায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপ্রতিনিধি, ঐতিহ্যবাহী নেতা, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি ও বিভিন্ন পেশাজীবীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২১ নভেম্বর ২০০৫ তারিখের ২০১৬/জয়েন্ট অপস(এ)/১৩০৪ নং স্মারকমূলে রাংগামাটি জেলা প্রশাসক এই কর্মশালা বন্ধের জন্য হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম'কে লিখিত নির্দেশ প্রদান করে। উল্লেখিত ছয় সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দসহ অংশগ্রহণকারীবৃন্দ সরকারের এই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাবে তাৎক্ষণিকভাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ছয় সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন, সরকারের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নাগরকি সমাজের বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে এবং এভাবে কর্মশালা বন্ধ করা সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী। তারা বলেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসেবে সকলেরই শান্তিপূর্ণভাবে যে কোন সভায় উপস্থিত ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। এমতাবস্থায় সরকারের কর্মশালা বন্ধের এই নির্দেশ পার্বত্যবাসীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের সামিল। সরকারের এই অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত মানবাধিকার, সুশাসন, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং সরকারের এহেন গর্হিত সিদ্ধান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ব্যাহত করবে। ◆

বিশেষ প্রতিবেদন

খাগড়াছড়ি জেলার গামারীঢালাতে সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ

গত ২৯ জানুয়ারী ২০০৬ খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার নুনছড়ি গ্রামের সেটেলার বাঙালীরা মহালছড়ি জোন ও বীজিতলা সাব-জোনের সেনাসদস্যদের সহায়তায় গামারীঢালা গ্রামের জুম্মদের ভোগদখলীয় ও রেকর্ডীয় ভূমিতে ঘরবাড়ী তৈরী শুরু করে। ২০ মার্চ ২০০৬ তারিখের মধ্যে তারা প্রায় ১১৫টি বাড়ী তৈরী করে এবং ১০০ একর ভূমি বেদখল করে। একই সাথে সেনাবাহিনী গামারীঢালা ও বীজিতলা গ্রামে অপারেশন চালাচ্ছে। ফলে নিরীহ গ্রামবাসী জুম্মরা ঘরছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে। ভূমিহারা জুম্মরা, যাদের ভূমি বেদখল করা হয়েছে, তারা খাগড়াছড়ি জেলার জেলা প্রশাসক, সেনাবাহিনীর খাগড়াছড়ি জেলার রিজিয়ন কমান্ডার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রত্যেকের বরাবরে স্মারকলিপি দিয়ে সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, ভূমি বেদখল করা বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু কোন কর্তৃপক্ষই সুষ্ঠু বিচার করেনি। বরঞ্চ মহালছড়ি জোনের জোন কমান্ডার লে. কর্ণেল শামসুদ্দিন এবং বীজিতলা সাবজোনের কমান্ডার মেজর বশির আহমেদ চৌধুরী এলাকায় সেনাটহল জোরদার করে সম্প্রসারিত গুচ্ছগ্রামের নিরাপত্তা জোরদার করেছে, সেটেলার বাঙালীদের বাড়ীঘর নির্মাণে সহায়তা দিয়েছে এবং জুম্মদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছে।

যতদুর জানা গেছে এই গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণে মূল ভূমিকা পালন করছে আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া এমপি। যিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডেরও অবৈধ চেয়ারম্যান। অন্যান্য বেদখলকারী সবাই হলেন নুনছড়ি গুচ্ছগ্রামের সেটেলার। তাদের মধ্যে রয়েছেন-

১) মো. ইসমাইল ফকির, ৬০, । বাড়ীঘর নির্মাণে সে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ২) মো. আহাদ, ইউপি সদস্য; ৩) মো. মোস্তফা, ৩৩
৪) মো. মতিউর রহমান, ৪১ ৫) মো. ইয়াকুব আলী বাহার ৬) মো. আলাউদ্দিন ৭) মো. রুহুল আমিন।
অন্যান্যদের মধ্যে হলেন মহালছড়ি জোনের জোন কমান্ডার লে. কর্ণেল শামসুদ্দিন এবং বীজিতলা সাবজোনের কমান্ডার মেজর বশির আহমেদ চৌধুরী (৩২ ই বেঙ্গল)। মো. ইসমাইল ফকির জানান যে, গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও বাড়ীঘর নির্মাণে তারা বিএনপি নেতা এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের সম্মতি পেয়েছে। তিনি গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণে কোনরকম বাধা প্রদান করা হলে সাম্প্রদায়িক হামলার ভয় দেখান।

৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ তারিখে উদ্ভূত পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রীতিবিন্দু দেওয়ান জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ির বরাবরে বিরোধ নিস্পত্তি করার আহ্বান জানান। কিন্তু পশমাসন কোনরকম সমাধানে উদ্যোগী হয়নি। এ প্রেক্ষিতে এলাকাবাসী প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠেন এবং ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ তারিখে খাগড়াছড়ি-মহালছড়ি- রাঙ্গামাটি সড়কে দিনব্যাপী সড়ক অবরোধ ঘোষণা করেন। তারা দাবী জানান যে,

১. জুম্মদের ভূমিতে সেটেলার বাঙালীদের তৈরী করা ঘরবাড়ী ভেঙে ফেলতে হবে;
২. সেটেলার বাঙালীদের জুম্মদের জায়গা হতে সরিয়ে নিজেদের গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নেয়া;
৩. সেটেলার বাঙালীদের দ্বারা জোরপূর্বক ভূমি বেদখল বন্ধ রাখা।

কিন্তু এতে প্রশাসনের পক্ষ হতে দাবী পূরণে বা সম্প্রসারিত গুচ্ছগ্রাম ভেঙে ফেলতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে প্রশাসন বিরত থাকে। ফলে আবার ১২-১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ পর্যন্ত একই সড়কে সড়ক অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়। যাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও খাগড়াছড়ি জেলা নাগরিক ফোরামও সমর্থন প্রদান করে।

গামারীঢালা এলাকাবাসীর ন্যায্য দাবীকে ভূলুণ্ঠিত করার জন্য প্রশাসনের তরফ হতে সমাধানের বিপরীতে নানান ভীতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তারই সূত্র ধরে ১২ ফেব্রুয়ারী মহালছড়ি জোন ও বীজিতলা সাবজোনের সেনাসদস্যরা জুম্মদের গ্রামে তল্লাশী চালায়। পরের দিন মাইসছড়ি ইউনয়নের চেয়ারম্যান সাজাই মারমা ও পানছড়ি কলেজের জনৈক প্রভাষককে আর্মীরা ভীতি প্রদর্শন করেন। গভীর রাতে আর্মীরা অত্র ইউনিয়নের সদস্য সুশীল জীবন চাকমাকে প্রাইমারী স্কুলে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। তাছাড়া সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে সেটেলার বাঙালীরা ১৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রায় ৫০টি ঘর নির্মাণ করে।

১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার জেলা প্রশাসক স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক ও সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এক সভা আহ্বান করেন। সভায় সেনা ও ও বেসামরিক প্রশাসনের কর্তারা আইনী সমাধানের বেড়াজালে ঠেলে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু উপস্থিত জুম্মরা এর বিরোধীতা করে বলেন যে, আইনী সমাধানের নামে এতে সময় ক্ষেপন করা হবে এবং কোন ইতিবাচক সমাধান প্রদান করা হবে না। তারা উল্লেখ করেন যে, আগেও এধরণের সমাধানের নামে লেমুছড়ি, পাকুজ্যাছড়ি, মাইসছড়ি জয়সেন পাড়া, সাপ্রু কার্বারী পাড়া এবং বড়নালা পাড়ার ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি না করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধের জন্য গঠিত নিম্ন আদালত উপজেলা নির্বাহী

অফিসার ও জেলা প্রশাসকের দ্বারা গঠিত যা নিরপেক্ষ নয়; বরং সাম্প্রদায়িক এবং এক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ রয়েছে। এ ধরণের প্রতারণার শিকার হওয়ার কারণে জুম্মরা দ্রুত সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নেবার দাবী জানান। শেষ পর্যন্ত ঐ সভাটি কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে শেষ হয়ে যায়।

এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারী উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনে সেনাবাহিনীর খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কমান্ডার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা এবং খাগড়াছড়ি জেলা নাগরিক ফোরামের সদস্যসচিব সন্তোষিত চাকমা বকুল এর মধ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সেটেলার বাঙালীদেরকে গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নেয়া হবে বলে রিজিয়ন কমান্ডার আশ্বস্থ করেন। তার সূত্র ধরে গামারীঢালা এলাকাবাসীরা সড়ক অবরোধ কর্মসূচী প্রত্যাহার করে।

২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ তারিখে বীজিতলা সাব জোনের কমান্ডার গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করণে স্থানীয় জুম্ম নেতা ও সেটেলার বাঙালীদের সাথে বৈঠকে বসেন। এতে জুম্মদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রীতিবিন্দু দেওয়ান, নুনছড়ি মৌজার হেডম্যান কেষ্ট মোহন রোয়াজা, গামারীঢালা মৌজার হেডম্যান দুর্ব রঞ্জন চাকমা। সভায় ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরে সভার রেজুলেশনে উল্লেখ করা হয় যে, সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নেয়া হবে তবে তাদের দখলকৃত ভূমিতে চাষাবাদের অধিকার থাকবে। ফলে জুম্মরা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

জানা গেছে যে, ৪ মার্চ তারিখে রাত ১১ টায় মেজর বশিরের নেতৃত্বে একদল আর্মী গামারীঢালা ও বীজিতলা গ্রামে হামলা চালায়। তারা নিরীহ গ্রামবাসীদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন-

১) কমলা রঞ্জন চাকমা, ৪৫, পীং- মৃত বুদ্ধ মনি চাকমা, বীজিতলা ২) প্রীতি জীবন চাকমা, ৩০, পীং- চিরিং চাকমা, ২ নং প্রকল্প গ্রাম, ৩)অংক্য মারমা, ৩০, পীং- পা থু মারমা, ঐ ৪) বাঁশী চাকমা, পীং- সুরেন্দ্র চাকমা, রাবার বাগান, ৫) সুশীল কান্তি চাকমা বনমালী, ৪৬, পীং- হরিশচন্দ্র চাকমা, রাবার বাগান
তাদেরকে বেধড়ক মারধোর করা হয়েছে। বিশেষ করে সুশীল কান্তি চাকমা মারাত্মক আহত হলে তাকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে থানায় চালান দেয়া হয়।

৫ মার্চ ২০০৬ তারিখে বিকেল ৩টার দিকে খাগড়াছড়ি রিজিয়নের ক্যাপ্টেন জাহিদের নেতৃত্বে একদল সেনা জওয়ান কোর্ট থেকে সুশীল কান্তি চাকমা এবং কমলা রঞ্জন চাকমাকে ধরে নিয়ে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের প্রাঙ্গণে তাদের হাতে অস্ত্র গুজিয়ে দিয়ে ছবি তোলে। স্থানীয় সাংবাদিক ও আইনজীবিরা তা প্রত্যক্ষ করেন। খাগড়াছড়ি জেলা আইনজীবি সমিতি সেনাবাহিনীর এধরণের ন্যাক্কারজনক কাজকে ধিক্কার জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে। এতে সমিতির সম্পাদক এডভোকেট আশুতোষ চাকমা স্বাক্ষর করেন।

সামরিক বেসামরিক প্রশাসনের এহেন রুদ্রমূর্তি দেখে জুম্মরা ৬ মার্চ হতে অনির্দিষ্টকালের জন্য খাগড়াছড়ি জেলা শহরে হরতাল আহ্বান করে। তবে ৭ মার্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ায় তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত করা হয়।

৭ মার্চ ২০০৬ তারিখে মহালছড়ি জোনের একদল আর্মী লেমুছড়ি গ্রামে হামলা চালায় তখন তারা নিরীহ গ্রামবাসীদের গ্রেফতার করার প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মুখে তারা ক্ষান্ত হতে বাধ্য হয় এবং পরে মহালছড়ি থেকে পুলিশ এনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- ১) বিবরণ চাকমা, ৩৫, পীং- মৃত সুভাস চন্দ্র চাকমা ২) শান্তিমনি চাকমা, ১৭, পীং- গোপাল কান্তি চাকমা ৩) নানক্য চাকমা, ১৭, পীং- মৃত সোনারঞ্জন চাকমা

তাদেরকে মহালছড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের নিয়ে যাওয়া হলে গ্রামবাসীরা পুলিশের উপর চাপ দেয় এবং পুলিশ তাদেরকে থানা হতে পরের দিনে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

৯ মার্চ তারিখে মহালছড়ি জোনের আর্মীরা আবার পাকুজ্যাছড়ি গ্রামের সংঘমিত্র চাকমা নামে একজন জুম্মকে গ্রেফতার করে। পরের দিন তাকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে সন্ত্রাসী সাজিয়ে কোর্টে চালান দেয়া হয়। ধারণা করা হয় যে, তার বাবা ধীনেন্দ্র চাকমা লেমুছড়ি মৌজার হেডম্যান হওয়ায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মহালছড়ি জোনের সহায়তা বিগত ২০০৪ সাল হতে সেটেলার বাঙালীরা জুম্মদের ভূমি বেদখল করে গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করে চলেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কার্যকরী না করে প্রশাসন জুম্মদেরকে উচ্ছেদ করে ভূমি বেদখল, গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও সেনাসন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। যার মূল লক্ষ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের নিশ্চিহ্ন করে ইসলামী সম্প্রসারণবাদ বজায় রাখা। বর্তমানে এলাকায় চরম উত্তেজনা ও ভীতি বিরাজ করছে। ◆

বিশেষ প্রতিবেদন

জুম্ম নারীদের উপর যৌন ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে

পূর্বের মতো জুম্ম নারীদের উপর সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাঙালীদের যৌন ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। জুম্মদের ভূমি জবরদখল, ভীতি সৃষ্টি ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ ও বিতাড়ন, পাশবিক লালসা চরিতার্থ করা, সর্বোপরি অপহরণ করে জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ও বিয়ে করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী, সেটেলার বাঙালী ও বহিরাগত চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ীরা জুম্ম নারী ও শিশুদের ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, হত্যা, অপহরণ, নির্যাতন ইত্যাদি পাশবিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরও চুক্তি মোতাবেক সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার না হওয়া, ভূমি কমিশনের মাধ্যমে জুম্মদের ভূমি ফেরৎ না দেয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরীতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ না দেয়ার কারণে জুম্ম নারী সমাজ এখনো এসব নগ্ন সাম্প্রদায়িকা ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও সদ্য আগত বহিরাগত বাঙালীদের বসতিস্থাপনের জন্য এই হীন কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা গেল-

দীঘিনালায় সেটেলার বাঙালীর ছরিকাঘাতে এক এনজিও মহিলা কর্মি নিহত

গত ৫ ডিসেম্বর ২০০৫ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন জামতলী সেটেলার গ্রামে একদল সেটেলার বাঙালীর ছরিকাঘাতে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক-এর মাঠকর্মি মিসেস যোশি চাকমা সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর ঋণ সংগ্রহের পর বাড়ী ফেরার পথে খুন হয়েছেন। উত্তোলিত ঋণের টাকা দিতে অস্বীকার করলে দুস্কৃতকারী সেটেলাররা যোশি চাকমাকে ছুঁড়ি দিয়ে আঘাত করে এবং ২০,০০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এরপর যোশি চাকমাকে পাশ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে কর্তব্যরত ডাক্তার ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা যোশিকে মৃত ঘোষণা করে। এদিন বিকেলে পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত এক সেটেলার বাঙালীকে গ্রেফতার করে।

রাঙ্গামাটিতে সেনাসদস্যদের গুলিতে জুম্ম নারী আহত

গত ২৯ জানুয়ারী ২০০৬ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি গ্রামের মিতা চাকমা (২৩) স্বামী পুনংচান চাকমা নামের এক জুম্ম নারী সেনাসদস্যদের গুলিতে আহত হয়েছেন। ঐদিন রাঙ্গামাটি ব্রিগেডের অধীন রাঙ্গামাটি জোনের একদল সেনাসদস্য প্রতিদিনের মত সাপছড়ি পাহাড়ী এলাকায় টার্গেট শুটিং শুরু করে। কিন্তু তারা নির্ধারিত এলাকা ছাড়াও এলোপাথারিভাবে গুলি ছুঁড়তে থাকে। ফলে নিজের বাড়ীর সামনে বসে থাকা মিতা চাকমার ডান কাঁধে এসে লাগে একটি গুলি। এতে মিতা চাকমা আহত হয় এবং তাকে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

নানিয়ারচরে সেনাসদস্যদের কর্তৃক এক জুম্ম নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা

গত ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর জোনের অধীন ২৮ বেঙ্গল বাঘছড়ি ক্যাম্পের জনৈক সুবেদার নানিয়ারচর উপজেলাধীন বাঘছড়ি যৌথখামার গ্রামের মিস কালিন্দী রাণী চাকমা (১৯) পীং মনোরঞ্জন চাকমা নামের এক জুম্ম নারীকে জোরপূর্বক শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। পরে জোন কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি করেও এর কোন সুরাহা পায়নি গ্রামবাসীরা। পক্ষান্তরে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে দিয়ে এ ঘটনাটি বানোয়াট বলে অপপ্রচার করার চেষ্টা করে।

বিলাইছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্ম কিশোরী ধর্ষিত

গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের পিক্কাছড়ি গ্রামের মিস মুইমা মারমা (১৪) পীং চক্রাঅং মারমাকে কেংড়াছড়ি সেটেলার গ্রামের আয়নাল পীং হাশেম আলী ও জালাল পিতা অজ্ঞাত ধর্ষণ করে। সেদিন মুইমা মারমা জঙ্গলে বাঁশ কাটতে গেলে সেটেলার বাঙালীরা একা পেয়ে ধর্ষণ করে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক এক জুম্ম নারী ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার শিকার

গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন বাইসারি ইউনিয়নের ধামানপাড়া এলাকার মিস কিংচায়ে মারমা (১৪) পীং মৃত ক্যফা মারমা একদল সেটেলার বাঙালী কর্তৃক গণধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছে। ধর্ষণকারী ও হত্যাকারী যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে তারা হল- হুমায়ুন কবির চৌধুরী রাবার ফ্যাক্টরীর কর্মচারী (১) বেলাল, পীং সিদ্দিক আহমদ, (২) জয়নাল, পীং নাজির আহমদ, (৩) মো: কামাল, (৪) মো: আব্দুল্লাহ, (৫) মো: আকতার, (৬) শাহ আলম, (৭) মো: আলম এবং কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলাধীন গজনিয়া ইউনিয়নের থইগ্যা কার্টা এলাকার আরও ৪/৫ জন।

জানা যায়, ঐদিন বিকাল ৫:০০ টায় মিস কিংচায়ে মারমা লামা উপজেলাধীন মাগ্যাপাড়া হতে বাড়ী ফিরছিল। যখন সে হুমায়ুন কবির চৌধুরী রাবার ফ্যাক্টরীর পাশ্ববর্তী এলাকায় পৌছে, তখনই উপরোক্ত দুস্কৃতিকারীরা তাকে অপহরণ করে। এ ব্যাপারে অপহৃতার মামা বাইশারি ইউনিয়নের সাধু পাড়ার মং ওয়াং মারমা, পীং নামেই মারমা নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় জিডি করে। জিডি নং- ৮৮১, তারিখঃ ২৭/০২/২০০৬। পরে ঘটনার মূল হোতা বেলাল, পীং সিদ্দিক আহমদকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী গত ১৫ মার্চ ২০০৬ বিকাল ৩:০০ টায় হুমায়ুন কবির চৌধুরীর রাবার বাগান এলাকা হতে কিংচায়ে মারমার লাশ উদ্ধার করা হয়। পরদিন মৃতের লাশ ময়না তদন্তের জন্য বান্দরবান জেলা সদরে পাঠানো হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অন্যান্য অপরাধীদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

ঘাগড়ায় এক বাঙালী কর্তৃক এক জুম্ম নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা

গত ২৩ মার্চ ২০০৬ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের যৌথখামার এলাকার এক বিধাব জুম্ম নারী রাজেশ্বরী চাকমা (৪০) স্বামী- মৃত ধেঙা চাকমার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে চট্টগ্রাম জেলাধীন রাঙ্গুনিয়া থানার মঘাছড়ি এলাকার বাসিন্দা মোঃ রফিক (৩০) পিতা- আবদুল সালাম নামের জনৈক বাঙালী।

জানা যায়, ঐদিন আনুমানিক রাত ৯.৩০ টায় চট্টগ্রাম জেলাধীন রাঙ্গুনিয়া থানার মঘাছড়ি এলাকার বাসিন্দা মোঃ রফিক (৩০) পিতা- আবদুল সালাম রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের যৌথ খামার পাড়ায় মদ্য পান করতে যায়। মদ্য পান শেষে ফেরার সময় উক্ত মোঃ রফিক যৌথখামার পাড়ারই রাজেশ্বরী চাকমা (৪০) স্বামী- মৃত ধেঙা চাকমাকে পথিমধ্যে একা পেয়ে শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে ঝাপটে ধরার চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ আতঙ্কিত রাজেশ্বরী চাকমা চিৎকার শুরু করলে আশেপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় এবং তাদের দুইতিন জন মোঃ রফিককে ধরে তাড়িয়ে নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত রাজেশ্বরী চাকমা শ্লীলতাহানি থেকে রক্ষা পায়।

মাইসছড়ি সাম্প্রদায়িক হামলায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক ২ জুম্ম নারী ধর্ষণের শিকার

গত ৩ এপ্রিল ২০০৬ সকাল প্রায় ৮:৩০ টায় আনুমানিক প্রায় ১৫০ বাঙালী সেটেলার ধারালো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের সাপ্রু কার্বারী পাড়া, নুয়া পাড়া, চক্র পাড়া, পাইসি মহাজন পাড়া ও পথা পাড়া নামক পাঁচটি জুম্ম গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। হামলায় মাইসছড়ি এলাকার ২ জন জুম্ম নারী ধর্ষণের শিকার হয় এবং ৫০ (পঞ্চাশ) জনের অধিক জুম্ম গ্রামবাসী আহত হয়। হামলার শিকার দুই জুম্ম নারী হল- (১) মিস থুইম্রাজাই মারমা (১৬), পীং- মমং মারমা ও (২) মিস ক্রাজাইমা মারমা (২০), পীং- রিপ্রুচাই মারমা।

উল্লেখ্য, গত ২ এপ্রিল ২০০৬ জয়সেন কার্বারী পাড়া হতে একদল সেটেলার বাঙালী মহিলা জুম্মদের ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে সাপ্রু কার্বারী পাড়ায় গিয়ে আদিবাসী জুম্মদের মালিকানাধীন ভূমিতে বাড়ীঘর নির্মাণ করতে শুরু করে। এ সময় সাপ্রু কার্বারী পাড়ার কয়েকজন জুম্ম মহিলা সেটেলার বাঙালী মহিলাদের বাঁধা দেয়। এই ঘটনার পরবর্তীতে ৩ এপ্রিল ২০০৬ সকাল প্রায় ৮:৩০ টায় সেটেলার বাঙালী মহিলারা প্রথমে সাপ্রু কার্বারীর জুম্মদের ঘরবাড়ীতে ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে। এর প্রতিবাদ করতে থুইম্রাজাই মারমা (১৬) পীং মমং মারমা ও ক্রাজাইমা মারমা (২০) পীং রিপ্রুচাই মারমা নামের দুই জুম্ম তরুনী যখন বাড়ীর বাইরে আসে তখন বাঙালী সেটেলাররা তাদেরকে চিরকালের জন্য এই স্থান ত্যাগ করতে বলে। জুম্ম মহিলারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে বাঙালী সেটেলাররা তখন তাদেরকে আক্রমণ করে। তাদের চিৎকার শুনে তরুনীদ্বয়ের মা যথাক্রমে আবাইক্রাই মারমা, স্বামী- মমং মারমা ও মিয়াসু মারমা (৪৮), স্বামী- রিপ্রুচাই মারমা ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে আসে। তখন সেটেলাররা এই চারজন জুম্ম মহিলাকে ধরে ফেলে এবং রশি দিয়ে বেঁধে জয়সেন কার্বারী পাড়ার একটি সেটেলার বাঙালী ঘরে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেখানে বাঙালী সেটেলাররা তাদেরকে পাশবিক কায়দায় মারধর করে এবং থুইম্রাজাই মারমা (১৬) ও ক্রাজাইমা মারমা (২০)কে ধর্ষণ করে।

মানিকড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক একজন জুম্ম নারী ধর্ষিত

গত ৭ এপ্রিল ২০০৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মানিকছড়ি উপজেলাধীন বদনাতলী-লেপ্যাপাড়া এলাকার ডম্রাচিং মারমা (১৬) পীং- মংচাই মারমা বাড়ীর পাশ্ববর্তী কুয়ো থেকে খাবার পানি আনতে গেলে বদনাতলী এলাকার বাঙালী সেটেলার মোঃ আলমগীর পীং- মোঃ বাদোদ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানিকছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ ধর্ষক সেটেলার বাঙালীকে গ্রেপ্তারের কোন উদ্যোগ নেয়নি। মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ডম্রাচিং মারমাকে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। আত্মীয়রা অভিযোগ করেছে যে, চিকিৎসকরা অনেক দেরীতে মেডিকেল পরীক্ষা করে এবং কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষার অনেক আলামত নষ্ট করেছিল। এর প্রতিবাদে জনৈক নার্স মেডিকেল পরীক্ষায় সদস্য হিসেবে থাকতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বলেও জানা যায়।

বিধবা রূপালী চাকমাকে দ্বিটিলা ক্যাম্পের সেনা সদস্য কর্তৃক ধর্ষণ

গত ১০ এপ্রিল ২০০৬ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইহাটের হাজাছড়ি গ্রামের শ্রীমতি রূপালী চাকমা (২৬) স্বামী মৃত ধন বিকাশ চাকমা নামে এক বিধবাকে বাঘাইহাট সেনা জোন নিয়ন্ত্রণাধীন দ্বিটিলা ক্যাম্পের সুবেদার কোবাদ আলী (৩৩ বেঙ্গল) কর্তৃক ধর্ষণ করা হয়।

ঘটনার দিনে সকাল বেলায় তিন সন্তানের জননী অসহায় বিধবা রূপালী চাকমা সরকারী বিধবা ভাতা সংগ্রহ করতে বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরে যায়। কিন্তু বাঘাইছড়ি উপজেলা অফিসে গিয়ে জানতে পারে যে, সেদিন বিধবা ভাতা দেয়া হচ্ছে না; দেয়া হচ্ছে বৃদ্ধ ভাতা। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস থেকে জানানো হয় হয়, জুম্মদের বিজু উৎসবের পরে বিধবা ভাতা দেয়া হবে। এটা জানার পর রূপালী চাকমা দেরী না করে বাড়ীর উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়িগামী একটি কোষ্টারে উঠে। কোষ্টারটি বাঘাইছড়ি থেকে সকাল সাড়ে ১০ ঘটিকায় ছাড়ার পর আনুমানিক ১১ ঘটিকার সময় উক্ত দ্বিটিলা ক্যাম্পে এসে পৌঁছে। বাসটি তল্লাসী করা হবে মর্মে বাসে আরোহী অন্যান্য যাত্রীদের মতো তাকেও বাস থেকে নামতে বলা হয়। উক্ত ধর্ষক সুবেদার কোবাদ আলী ও অপর দুইজন আনসার সদস্য যাত্রীদের তল্লাসী করে। তল্লাসীর একপর্যায়ে তারা রূপালী চাকমার বিধবা ভাতা বইটি খতিয়ে দেখে। এটার দেখার পর রূপালী চাকমাকে যাত্রী ছাউনিতে বসিয়ে রেখে বাসের অন্যান্য যাত্রীদের বাসে উঠতে নির্দেশ দেয় এবং বাসটি চলে যেতে ইঙ্গিত দেয়। বাসটি চলে যাওয়ার পর উক্ত সুবেদার কোবাদ আলী অপর দুইজন আনসার সদস্যকেও চলে যেতে নির্দেশ দেয়। তারা তাকে 'স্যার' সম্বোধন করার পর চলে যাওয়ার পর সুবেদার কোবাদ আলী রূপালী চাকমাকে হাতে ধরে জোরপূর্বক ক্যাম্পের একটি কক্ষে নিয়ে যায়। সেই কক্ষে একটি বিছানা ছিল। উক্ত কক্ষে সুবেদার কোবাদ আলী তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। রূপালী চাকমা অনেক ধস্তাধস্তি করেও ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ধর্ষণের পর সুবেদার কোবাদ আলী তাকে হুমকি দেয় যে, উক্ত ঘটনা কারোর কাছে প্রকাশ করা যাবে না। প্রকাশ করলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। পরবর্তীতে এক ঘন্টার পর আসা একটি যাত্রীবাহী চাঁদের গাড়ীতে (জীপ) তাকে তুলে দেয়া হয়।

মাটিরাঙ্গায় জুম্ম কিশোরী অপহৃত

গত ১৭ এপ্রিল ২০০৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তাইন্ডং-এর কৃষ্ণ দয়াল কার্বারী পাড়ার যমুনা ত্রিপুরা (১৪) পীং- কৃষ্ণ দয়াল ত্রিপুরা নামে এক জুম্ম কিশোরীকে একদল সেটেলার বাঙালী কর্তৃক অপহরণ করা হয়েছে। যমুনা ত্রিপুরা পানছড়ি বাজার হাই স্কুল এন্ড কলেজের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী। অপহরণকারীদের মধ্যে যাদেরকে চিহ্নিত করা গেছে তারা হল- (১) মোঃ আবুল কালাম, (২) মোঃ আব্দুল হক পীং চান মিঞা ও (৩) মোঃ মনির পীং ফরিদ মিঞা। উক্ত চিহ্নিত অপহরণকারীদের সবাই খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বিডি পাড়ার বাসিন্দা। জানা যায়, স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার ব্যাপারে মামলা নিতে অস্বীকার করেছে। অপরদিকে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপহৃতাকে উদ্ধার করা হয়নি এবং অপহরণকারীদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

রামগড়ে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক একজন জুম্ম নারীর গণধর্ষণের শিকার

গত ৩০ জুন ২০০৬ খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড় উপজেলার নাকাপা থলি পাড়ায় একদল সেটেলার বাঙালী কর্তৃক নুনু মারমা পীং ফেলাং মারমা নামে এক জুম্ম নারীকে ধর্ষণ করা হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ঘটনার তিনদিন আগে রামগড় সদর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বড়খেদা গ্রামের বাসিন্ধা ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ফেলাং মারমার মেয়ে নুনু মারমা উপজেলার নাকাপা থলি পাড়া গ্রামে তার আত্মীয় যতীন মোহন ত্রিপুরার বাড়ীতে বেড়াতে যায়। তার আত্মীয়ের বাড়ীতে অবস্থান কালে ৩০ জুন আনুমানিক ১.৩০ টায় পাতাছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিন হাবিলদার ধরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলে নিম্নোক্ত সেটেলার বাঙালীরা নুনু মারমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের সময় অপহরণকারী সেটেলার বাঙালীরা বাড়ীর মালিক যতিন মোহন ত্রিপুরা ও তার স্ত্রীকে বাড়ীতে রশি দিয়ে বেঁধে রেখে যায়। এরপর আধা কিলোমিটার দূরবর্তী একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে নিয়ে সেটেলার বাঙালীরা রাতভর নুনু মারমাকে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি জানাজানি হলে পরদিন সকালে যতিন মোহন ত্রিপুরা, দীপু ত্রিপুরাসহ কয়েকজন গ্রামবাসী পাতাছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিন হাবিলদারের বাড়ীতে গিয়ে ঘটনাটি জানায় এবং কেন ধরে আনা হয়েছে জিজ্ঞাসা করে। এরপর কোন কথা না বলে চেয়ারম্যান লোক পাঠিয়ে দু'জন লোককে ধরে আনে। আনার সাথে সাথে চেয়ারম্যান তাদেরকে মারধর করে এবং তারা ধর্ষণকারীদের নাম বলে দেয়। ধর্ষণকারীরা হলো- ১) ১। মোঃ আবদুল কাদের (৩০) পীং সায়েম উদ্দিন মুন্সী, গ্রাম নাকাপা গুচ্ছগ্রাম, পাতাছড়ি ইউপি ২) ২। মোঃ শাহাজাহান মিয়া (৩৫) পীং আহামুদুর রহমান, গ্রাম নাকাপা গুচ্ছগ্রাম, পাতাছড়ি ইউপি ৩) মোঃ জাকির হোসেন (২৬) পীং বাচ্চু মিয়া, গ্রাম নাকাপা গুচ্ছগ্রাম, পাতাছড়ি ইউপি। এরপর অনেক খোঁজাখুজির পর নুনু মারমাকে উপজেলার বড়খেদা গ্রামে বালাসু মারমার (নুনু মারমার মামা) বাড়ী থেকে উদ্ধার করা হয়। সেসময় নুনু মারমা ভীতসন্ত্রস্থ ছিল। পরে স্বেচ্ছায় বাদী হয়ে নুনু মারমা কর্তৃক ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে রামগড় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। ◆

বিশেষ প্রতিবেদন

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ৫ম অধিবেশন ও বাংলাদেশ সরকারী প্রতিনিধির হাস্যকর বক্তব্য

গত ১৫-২৬ মে ২০০৬ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ৫ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বছরের মতো এবারও উক্ত অধিবশনে সরকারী, আদিবাসী সংগঠন ও জাতিগোষ্ঠী, এনজিও, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ও দাতাসংস্থাসমূহের প্রায় ১২ শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এবারের অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য এবং আদিবাসী জাতিসমূহ ঃ লক্ষ্যের নয়া সজ্ঞায়িতকরণ'। অধিবেশনে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ বলেন যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য গ্রহণের সময় আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না এবং এসব লক্ষ্যের মধ্যে আদিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন চোখে পড়ে না। তাই এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করার সময় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যকে আবার নতুনভাবে সজ্ঞায়িত করতে হবে বলে আদিবাসী প্রতিনিধিরা জোরালো অভিমত তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ থেকে চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, বিশিষ্ট গবেষক আলবার্ট মানকিন, মিতালী চিসিম প্রমুখ আদিবাসী নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। উক্ত অধিবেশনে দিল্লীস্থ পিস ক্যাম্পেইন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক প্রজ্ঞালঙ্কার ভিক্ষু ও লন্ডন ভিত্তিক জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক-ইন্টারন্যাশনালের আইনা হিউম প্রমুখ মানবাধিকার কর্মীরাও যোগদান করেন। গত বছরের মতো এবারও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের পক্ষে মিশনের ফাষ্ট সেক্রেটারী ইসরাত জাহান চৌধুরী যোগদান করেন।

গত বছরের মতো এবারের অধিবেশনেও বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী মিশনের ফাষ্ট সেক্রেটারী ইসরাত জাহান চৌধুরীর বক্তব্য বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এবারে গত বছরের তুলনায় অধিকতর উলঙ্গ ও আক্রমণাত্মক ভাষায় তিনি তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যে এই ফোরামকে অবমাননাকর ও অসৌজন্যমূলক ভাষায় 'টক-শো' বলে উল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী আদিবাসী নেতৃবৃন্দের উত্থাপিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলী সরাসরি 'বানোয়াট' বলে অভিহিত করেন। আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত ভাষায় আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামকে 'টক-শো' বলে মন্তব্য করার ফলে অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী অনেকেই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। বিশেষ করে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের অন্যতম সদস্য ও কানাডিয়ান আদিবাসী নেতা ওয়ালি লিটলচাইল্ড এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং উত্থাপিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলী 'বানোয়াট' কিনা তা তদন্তের আহ্বান জানান। ফোরামের চেয়ারপার্সন মিজ ভিক্টোরিয়া টাউলি-কর্পুজ তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর সরেজমিন সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, সরকার রাজী থাকলে ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ে ফোরামের সদস্য হিসেবে তারা পূর্ণ সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত রয়েছে। এমনকি সরকার ও আদিবাসীদের মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠানে ফোরাম মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করতেও প্রস্তুত বলে তিনি জানান। বলাবাহুল্য এসব তাৎক্ষণিক আহ্বানের কোন উত্তর দেননি বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী মিশনের ফাষ্ট সেক্রেটারী।

বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের ফাষ্ট সেক্রেটারীর এবারের বক্তব্যে আরো বেশ কয়েকটি হাস্যকর, মনগড়া ও বিকৃত তথ্য তুলে ধরা হয়। তন্মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে- 'উপজাতীয়রা কয়েক শতাব্দীর আগে বাংলাদেশের পূর্ব দিক থেকে আগত বহিরাগতদের বংশধর' বলে উল্লেখ করা। তাঁর এই বক্তব্য সম্পূর্ণ বিকৃত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। বলাবাহুল্য যুগ যুগ ধরে এসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী ভারত ও মায়ানমারে বসবাস করে আসছে এবং সময়ে সময়ে এসব ভূখন্ডে গমনাগমন করে আসছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে বাঙালী জনগোষ্ঠী লোকজন আসার বহু শতাব্দীর আগে থেকেই তারা এসব অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। বার্মা, চাকমা, ত্রিপুরা, পোর্তগিজ ও ব্রিটিশ-ভারতের ইতিহাসে সহজে তার সত্যতা পাওয়া যায়। অপরদিকে বাংলাদেশের অনেক আইনে যেমন- ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৯৫ সালে জাতীয় সংসদে প্রণীত ১২নং আইন ও এ আইনের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১২ জুলাই ১৯৯৫ জারিকৃত সরকারি পরিপত্র, অতি সাম্প্রতিক কালে প্রণীত 'দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র' প্রভৃতি ক্ষেত্রে এসব জনগোষ্ঠীসমূহকে 'আদিবাসী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং সরকারী স্থায়ী মিশনের ফাষ্ট সেক্রেটারীর বক্তব্য হাস্যকর বৈ কিছু নয়।

বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের ফাষ্ট সেক্রেটারী তাঁর বক্তব্যে আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের আদিবাসী (তাঁর ভাষায় উপজাতীয়) প্রতিনিধিদের দেয়া অধিকাংশ বক্তব্য বানোয়াট। সরকারকে বলির পশু করিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে তারা সরকারের বিরুদ্ধে এসব মিথ্যা বক্তব্য প্রদান করছে। সরেজমিন তদন্ত করে দেখা গেছে এসব ঘটনাবলীর সবক'টি সাধারণ অপরাধ- যা অন্যান্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ঘটছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর এই বক্তব্যের

প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আদিবাসী প্রতিনিধিরা বলেন, বস্তুতঃ আদিবাসীদের বক্তব্য নয়, তাঁর বক্তব্যই বানোয়াট। কারণ একের পর এক সংঘটিত গণহত্যা, সাম্প্রদায়িক হামলা, অপহরণ ও ধর্ষণ, সেনা সহিংসতা ইত্যাদি কোন ঘটনাই তদন্ত করা হয়নি। অপরদিকে গত বছরের মতো এবারের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ৫ম অধিবেশনেও আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সদস্যবৃন্দ ও এশিয়ান এন্ডিজেনাস পিপলস কোকাসসহ বাংলাদেশের আদিবাসী প্রতিনিধিরা আদিবাসী বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপিটিয়র-এর মাধ্যমে এসব ঘটনাবলী নিরপেক্ষ তদন্ত পূর্বক কোনটা বানোয়াট আর কোনটা বস্তুনিষ্ট তা যাচাইয়ের আহ্বান জানানো সত্ত্বেও জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী মিশনের প্রতিনিধি ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে থাকেন।

বলাবাহুল্য গত বছর আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ৪র্থ অধিবেশনে বাংলাদেশের আদিবাসী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আদিবাসীদের উপর দমন-পীড়নের পরিস্থিতি তুলে ধরা এবং আদিবাসীদের ভূমি জবরদখল ও তাদেরকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধের আহ্বান সম্বলিত বক্তব্য প্রদানের প্রেক্ষিতে এসব বক্তব্যকে 'দেশদ্রোহী', 'রাষ্ট্রবিরোধী', 'আপত্তিকর' বলে অভিহিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উক্ত আদিবাসী নেতৃবৃন্দকে সমন জারী করার উদ্যোগ নিয়েছিল। এমনকি এবছর যাতে বাংলাদেশের আদিবাসী প্রতিনিধিরা আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে যোগ দিতে না পারে তার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও গত ২৩ এপ্রিল ও ২৯ মে ২০০৬ অনুষ্ঠিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির দু'টি সভায় ক্ষমতাসীন দলের সাংসদ, গডফাদার ও সাম্প্রদায়িক নেতা আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া বক্তব্য তুলে ধরেন।

বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের প্রতিনিধি আরো উল্লেখ করেন যে, সরকারী চাকুরীতে উপজাতীয়দের জন্য ৫% কোটা সংরক্ষণ রয়েছে যদিও উপজাতীয়রা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.৫%। অপরদিকে উপজাতীয়দের প্রতি সরকারের ইতিবাচক কর্মসূচীর ফলে উপজাতীয়দের মধ্যে, বিশেষ করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী চাকমাদের শিক্ষার হার জাতীয় শিক্ষার হার থেকে অনেক উপরে বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের আদিবাসী প্রতিনিধিরা বলেন, বস্তুতঃ তাঁর এই বক্তব্য মনগড়া ও বিকৃত। আদিবাসীদের জন্য সরকারী চাকুরীতে ৫% কোটা সংরক্ষণ কেবল কাগজে-কলমে। বাস্তবে তার কোন প্রয়োগ নেই। বরঞ্চ সরকারী চাকুরীতে (জনসংখ্যা অনুপাতে) ১.৫% চাকুরীও আদিবাসীরা পায় না বলে বাংলাদেশের আদিবাসী প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেন। অপরদিকে কেবল এককভাবে চাকমাদের উদাহরণ তুলে ধরা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও বিভ্রান্তমূলক। তুলনামূলকভাবে অধিকতর পশ্চাদপদ ও স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন জাতিগোষ্ঠীসহ সার্বিকভাবে আদিবাসী/উপজাতীয়দের শিক্ষার হার জাতীয় শিক্ষার হারের চেয়ে অনেক অনেক নীচে তাতে কোন পরিসংখ্যানের উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়োজন পড়ে না। এখনো অনেক আদিবাসী/উপজাতীয় অধ্যুষিত গ্রামে সরকারী-বেসরকারী কোন বিদ্যালয় নেই। আদিবাসী/উপজাতীয় শিশুরা এখনো মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে ১৯৯১ ও ২০০১ সালের আদমশুমারীতে জাতিসত্ত্বা ভিত্তিক কোন তথ্য নেই। তিনি কোন তথ্যের ভিত্তিতে চাকমাদের শিক্ষার হার জাতীয় শিক্ষার হারের চেয়ে বেশী উল্লেখ করলেন তা বোধগম্য নয়। বলাবাহুল্য যে, চাকমাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও তা সম্ভব হয়েছে চাকমা জনগোষ্ঠীর কঠোর পরিশ্রমের ফলে। সরকারের ধনাত্মক নীতি এখানে তেমন ক্রিয়াশীল ছিল না বললেই চলে। পক্ষান্তরে কাপ্তাই বাঁধসহ সরকারের একের পর এক নেতিবাচক নীতির ফলে চাকমাদেরকে শিক্ষামুখী করতে বাধ্য করেছিল।

স্থায়ী মিশনের প্রতিনিধি আরো বলেছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সরকার পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৫২টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ প্রশ্ন করে বলেন, ১৫২টি ক্যাম্প প্রত্যাহারে যদি ৯ বছর সময় লাগে তাহলে ৫ শতাধিক ক্যাম্প প্রত্যাহারে কত যুগ লাগবে? অধিকন্তু সরকার পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প প্রত্যাহার করে থাকলে ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন জারী করা হলো কেন? 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে সাধারণ প্রশাসনের উপর কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ, সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি নারকীয় কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

বস্তুতঃ ১৫২টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের তথ্যও বস্তুনিষ্ঠ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রত্যাহৃত মাত্র ৩১টি ক্যাম্পের তালিকা জনসংহতি সমিতির নিকট পাঠানো হয়েছে। সরকারী দাবী অনুযায়ী প্রত্যাহৃত অবশিষ্ট ১২১টি ক্যাম্পের দলিল-দস্তাবেজ সরকার এখনো দেখাতে পারেনি। তাই বলা যায়, জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী মিশনের ফাষ্ট সেক্রেটারী ইসরাত জাহান চৌধুরীর বক্তব্যের প্রতি পদে পদে বানোয়াট, বিকৃত ও কাল্পনিক তথ্যে ভরা। ◆

বিশেষ প্রতিবেদন

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের প্রকাশিত পুস্তিকা ও সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ড বন্ধ করা হোক

গত এপ্রিল ২০০৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর-এর পৃষ্ঠপোষকতায় 'Khagrachari 2001-2005' নামে ইংরেজী ভাষায় এক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় এবং প্রকাশের পর উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে জেলা প্রশাসকের প্যাডে লিখিত অগ্রগামী চিঠিসহ উক্ত পুস্তিকা বিভিন্ন মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ও দাতাসংস্থাসমূহের নিকট প্রেরণ করা হয়। উক্ত অগ্রগামী চিঠি ও পুস্তিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামে স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাসকারী দশ ভাষাভাষি আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীসমূহকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করে তিনি 'বহিরাগত', 'বাঙালী-বিদ্বেষী', রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনাকারী বলে অভিহিত করেন।

জেলা প্রশাসকের মতো দায়িত্বশীল পদে আসীন হয়ে তাঁর এই জাতিবিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক ও উস্কানীমূলক কর্মকান্ডের ফলে তিন পার্বত্য জেলাসহ জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যথাযথ তদন্ত পূর্বক অবিলম্বে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, জেলা প্রশাসকের পদ থেকে অপসারণ এবং উক্ত পুস্তিকার সকল কপি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করার দাবী জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, খাগড়াছড়ি জেলা নাগরিক কমিটিসহ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। উল্লেখিত দাবীতে গত ১৬ জুলাই ২০০৬ খাগড়াছড়ি জেলা নাগরিক কমিটির উদ্যোগে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়েছে। কিন্তু আজ অবধি সরকারের তরফ থেকে উক্ত প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত বা জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে নানাভাবে সরকারের উর্ধ্বতন মহল, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত বিশেষ স্বার্থন্বেষী বাহিনী জেলা প্রশাসককে মদদ দিয়ে চলেছে বলে জানা গেছে। প্রকাশিত উক্ত পুস্তিকায় আপত্তিকর কিছু সাম্প্রদায়িক দিক নিম্নে তুলে ধরা হলো।

জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরিত অগ্রগামী চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, "In Khgagrachari there are mainly three tribes. They are Chakma (28%), Tripura (13%) and Marma (11%). There are some insignificant numbers of Monipuri and Shawtal here. History says that they all are outsiders. The tribes Kookies found at that time went against British Imperialism and were driven away with the help of new intruder tribes. In fact, we are nourishing these intruders with a lot of facilities by depriving the mainstream people."
এছাড়া উক্ত পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয় যে, "Chakma tribe.. speaks ill of establishment, dislikes the mainstream people or the Bengalee, even takes arms against them. Last of all in 1997 they surrendered arms after signing a controversial pact with Government of Bangladesh (GoB)."

উপরোক্ত বক্তব্য ও তথ্যাবলী নিঃসন্দেহে বিকৃত, মনগড়া ও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। বলাবাহুল্য ইতিহাস প্রমাণ করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জুম্ম জনগোষ্ঠীসমূহই এই অঞ্চলের প্রথম বসতিকারী ও ভূমিপুত্র। প্রাক-উপনিবেশিক যুগে এই অঞ্চল বঙ্গ দেশের অধীনস্থ বা অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে জানা যায়নি। বরং দেশের বর্তমান সিলেট, কুমিল্লাসহ বেশ কিছু অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ ছিল। এমনকি বর্তমান চট্টগ্রামের কিছু অংশসহ এই অঞ্চল কখনো কখনো আরাকান রাজ্যের অধীনে চলে গেছে বলেও ইতিহাসে জানা যায়। বলাবাহুল্য, ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তি আসার পূর্ব থেকেই বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার কিছু অঞ্চলসহ এই পার্বত্যাঞ্চলে জুম্ম জনগণ স্বাধীন সামন্ত রাজ্যের অধিকারী ছিল। বাঙালী জনগোষ্ঠীর লোকেরা আসার বহু পূর্ব থেকে জুম্মরা এই ভূখন্ডে বসবাস করতো। ১৭৬৩ সনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা নিযুক্ত চট্টগ্রাম কাউন্সিলের প্রথম প্রধান কর্মকর্তা Mr. Henry Verelst এই সামন্ত রাজ্যের সীমানা উল্লেখ করেন যে, The local jurisdiction of Chakma Raja Shermust Khan to be all the hills from Pheni river to the Sangu and from Nizampur road to the hills of Kuki Raja. উল্লেখ্য যে, জুম্মদের মধ্যে লাঙ্গল চাষ প্রবর্তনের লক্ষ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষান্তে চাকমা রাজা কর্তৃক কয়েক পরিবার বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি প্রদান করা হয়। ১৯৪১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আড়াই লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র আড়াই শতাংশের মতো (৭,২২০ জন) যারা বাঙালী ছিল, তারা ছিল সেই বসতিকারী বাঙালীদেরই বংশধর মাত্র। পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসনমালে ও অধুনা বাংলাদেশের শাসনামলে বিশেষ করে বিশেষ করে ১৯৭৯ সালে সরকারী উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ বহিরাগত বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি প্রদান করা হয়। ফলে জুম্ম জনগণই আজ নিজ দেশে পরবাসী হয়ে পড়েছে।

পুস্তিকায় জুম্মদেরকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনাকারী, বাঙালী-বিদ্বেষী, এমনকি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারনকারী, চাঁদাবাজ, অপহরণকারী ও হত্যাকারী হিসেবে উল্লেখ করে তিনি সাম্প্রদায়িক উস্কানী প্রদানের অপপ্রয়াস চালান। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান, সুদীর্ঘ কাল থেকে বঞ্চিত আদিবাসী জুম্মদের অধিকার সংরক্ষণ ও এই এলাকায় শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে 'বিতর্কিত চুক্তি' উল্লেখ করে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। অপরদিকে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে কিছু পরিসংখ্যানগত তথ্যাবলী পরিবেশন করা হয়, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমস্যা, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে মোটেও বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও পরিপূর্ণ নয়, বরং তা একান্তই খন্ডিত, বিকৃত ও একদেশদর্শী।

জেলা প্রশাসকের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল পদে আসীন হয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর এর এ ধরনের বিকৃত তথ্য প্রদান, জুম্ম জাতি বিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক ও পার্বত্য চুক্তি বিরোধী বক্তব্য প্রদান অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও বিপদজনক। জেলা প্রশাসক হিসেবে যেখানে তিনি সাম্প্রদায়িক উস্কানী রোধ করবেন ও জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন সেখানে তিনি স্বয়ং বিদ্বেষমূলক ও সাম্প্রদায়িক উদ্দাদনামূলক পুস্তিকা প্রকাশ ও চিঠি প্রেরণ করে উত্তেজনা সৃষ্টি ও শান্তি-ভঙ্গের ইন্ধন দিয়ে চলেছেন। উল্লেখ্য যে, জেলা প্রশাসক হিসেবে তিনি যোগদানের পর খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ, জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের ভূমি জবর-দখল ইত্যাদি শ্বেত-সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ড ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা সত্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনধারা দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্বার অধিকারী। তারই প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল তথা অঞ্চলের আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠী বিশেষ শাসনব্যবস্থা ভোগ করে আসছে। এই ঐতিহাসিক আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার একটা অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসকের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তা যদি এ ধরনের চুক্তি-বিরোধী ও জাতি-বিদ্বেষী কর্মকান্ড চালিয়ে থাকে স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীগণ উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত না হয়ে পারে না। অচিরেই জেলা প্রশাসকের এ ধরনের উস্কানীমূলক ও পক্ষপাতিত্বমূলক কর্মকান্ড বন্ধ করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই যথাযথ তদন্ত পূর্বক অবিলম্বে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, তাকে জেলা প্রশাসকের পদ থেকে অবিলম্বে অপসারণ করা এবং উক্ত পুস্তিকার সকল কপি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করার দাবী জানিয়েছে পার্বত্যবাসীসহ দেশের নাগরিক সমাজ। ◆

সংবাদ প্রবাহ

খাগড়াছড়িতে সেনাসদস্যের হাতে এক জুম্ম ছাত্র আহত

গত ২ নভেম্বর ২০০৫ দুপুর প্রায় ১২:০০ টায় এক সেনাসদস্য কর্তৃক কোদালের আঘাতে আহত হয়েছে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলাধীন রাঙ্গাপানিছড়া গ্রামের দীপন চাকমা (১৪), পীং মুরতি মোহন চাকমা নামের এক জুম্ম ছাত্র। দীপন চাকমা খাগড়াছড়ি ভোকেশনাল টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

জানা যায়, ঐদিন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন বগরাপাড়া ও নাথাপাড়া এলাকায় রবিচন্দ্র কার্বারী পাড়া ক্যাম্পের জনৈক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য তল্লাসী অভিযানে বের হয়। এক পর্যায়ে উক্ত দীপন চাকমার কাছ থেকে সেনাসদস্যরা নাথাপাড়ার পথ সম্পর্কে জানতে চায়। কিন্তু সেনাসদস্যদের কথা ভালোভাবে বুঝতে না পারায় দীপন চাকমা বগরাপাড়ার পথ দেখিয়ে দেয়। ফলে এক সেনাসদস্য রাগান্বিত হয় এবং এক পর্যায়ে দীপন চাকমার হাত থেকে কোদালটি কেড়ে নিয়ে ঐ কোদাল দিয়ে দীপন চাকমাকে আঘাত করে। এতে দীপন চাকমার পা মারাত্মকভাবে জখম হয় এবং তাকে জরুরী ভিত্তিতে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। উল্লেখ্য, দীপনকে আঘাত করার পর সেনাসদস্যরা দীপনের অভিভাবককে ১০০ টাকা দেয় এবং এ ব্যাপারে কোন কিছু না বলার জন্য নির্দেশ দিয়ে চলে যায়।

এম এন লারমার মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠান নস্যাৎ করতে ইউপিডিএফ ও সেনাসদস্যদের হামলা

গত ৯ নভেম্বর ২০০৫ আনুমানিক সকাল ১০টায় ইউপিডিএফ-এর একটি সশস্ত্র দল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন পানছড়ি উপজেলায় পানছড়ি বৌদ্ধ মন্দিরের পাশে এম এন লারমার ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে অস্থায়ী শহীদবেদী নির্মাণকালে জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মিদের উপর হামলা চালায়। তবে জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মিরা নিরাপদে পালাতে সক্ষম হয়।

ইউপিডিএফ-এর আক্রমনের পরপরই পানছড়ি জোনের জোন কমান্ডার মইন চৌধুরী ও টু-আইসি মেজর নাসিমের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য উক্ত শহীদবেদী নির্মাণস্থলে যান এবং সেখানে অবস্থানরত পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক নির্মল জ্যোতি চাকমাকে গ্রেফতার করেন। এরপর সেনাসদস্যরা নির্মল জ্যোতি চাকমাকে শান্তি রঞ্জন কার্বারী পাড়ায় নিয়ে যায় এবং ব্যাপক নির্যাতন চালায়। জোন কমান্ডার মইন চৌধুরী নির্মল জ্যোতি চাকমাকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ছেড়ে ইউপিডিএফে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন। অপরদিকে ইউপিডিএফে যোগ দিলে এবং সেনাবাহিনীর জন্য কাজ করলে তাকে টাকা দেয়া হবে বলেও জোন কমান্ডার লোভ দেখান। না হলে তাকে শারিরীক নির্যাতন ভোগ করতে হবে বলে হুমকি দেন জোন কমান্ডার। এভাবে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন ও হুমকির পর বিকেলে সেনাসদস্যরা নির্মল জ্যোতি চাকমাকে ছেড়ে দেয়।

লংগদুতে বিডিআর কর্তৃক ২ নিরীহ গ্রামবাসী গ্রেফতার

গত ১২ নভেম্বর ২০০৫ রাত আনুমানিক ৯টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার বগাচতরের কাঠালতলী বিডিআর ক্যাম্প ও রাজানগর বিডিআর জোনের একদল বিডিআর লংগদু উপজেলাধীন নলুয়া গ্রামে অভিযান চালায়। বিডিআর সদস্যরা প্রথমে আপন চাকমার বাড়ী ঘেরাও করে বাড়ীতে প্রবেশ করতে চাইলে আপন চাকমার স্ত্রী মিসেস মিলন শশী চাকমা তাতে বাধা দেয়। এরপর বিডিআর সদস্যরা বিশ্ব সহন চাকমার বাড়ী ঘেরাও করে এবং কোন অভিযোগ ছাড়াই সেখান থেকে ৩ গ্রামবাসী বিমল কান্তি কার্বারী, কালাকচু চাকমা ও সূর্য কুমার চাকমাকে আটক করে। এরপর বিডিআর সদস্যরা যখন উক্ত আটককৃতদের নিয়ে ক্যাম্পে ফিরছিল তখন তারা দিগন্ত চাকমা ওরফে পিচ্চু ও শুক্রমনি চাকমাকেও রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে আসে। পরে বিডিআর সদস্যরা সূর্য কুমার চাকমা ও শুক্রমনি চাকমাকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করে লংগদু থানায় সোপর্দ করে এবং অপর তিনজন গ্রামবাসীদের ছেড়ে দেয়।

রাঙ্গামাটিতে সেনাসদস্য কর্তৃক ২ নিরীহ ছাত্র অপহৃত

গত ১৩ নভেম্বর ২০০৫ সকাল প্রায় ১০:৩০ টায় একদল সেনাসদস্য কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরস্থ টিটিসি (রাঙ্গামাটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার) সড়ক হতে প্রণয়ন চাকমা (১৮) পীং- উৎপল চাকমা ও রমন চাকমা (১৮) নামে ৯ম শ্রেণীর দুই নিরীহ জুম্ম ছাত্রকে অপহরণ করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত ছাত্ররা যখন কলেজ গেইট এলাকার নিকটবর্তী টিটিসি সড়কে পৌঁছে তখন সেনাসদস্যরা তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চোখ বেঁধে দেয়। এরপর তাদের সেনাক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাথে জড়িত কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন করে মধ্য রাত পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর ঘটনাটি প্রকাশ করবে না- এই শর্তে রাত ২:০০ টায় কলেজ গেইট এলাকার গাউছিয়া মার্কেটের সামনে সেনাসদস্যরা উক্ত ২ ছাত্রকে ছেড়ে দেয়। চোখ বাঁধা থাকায় ছাত্ররা ক্যাম্প ও সেনাসদস্যদের নাম চিহ্নিত করতে পারেনি।

পানছড়িতে সেনাসদস্য কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্য গ্রেফতার

গত ১৪ নভেম্বর ২০০৫ বিকেল বেলা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার পানছড়ি সেনা জোনের কমান্ডার মেজর নাসিমের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য জনসংহতি সমিতির ৪ জন সদস্যকে তাদের বাড়ী থেকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত জনসংহতি সমিতির সদস্যরা হলেন- ১) সুশীল কুমার চাকমা ওরফে সোহেল (৪৩), পীং- সিদ্ধধন চাকমা, সাং- শুভধন হেডম্যান পাড়া, পানছড়ি; ২) গজেন্দ্র লাল চাকমা (৪৮), পীং- প্রয়াত রমনী মোহন চাকমা, সাং- শুভধন হেডম্যান পাড়া, পানছড়ি; ৩) শান্তি চাকমা (৩০), পীং- প্রয়াত নলিনী কুমার চাকমা, সাং- বরকলক, পানছড়ি; ৪) উজ্জ্বল চাকমা ওরফে মদভাদি (৩২), পীং- খগেন্দ্র লাল চাকমা, সাং- ভারতবর্ষ পাড়া, পানছড়ি।

জানা যায়, জোন কমান্ডার ডেকেছেন মর্মে সেনাসদস্যরা প্রথমে উক্ত ৪ জুম্মকে জোনে যেতে হবে বলে উল্লেখ করে। কিন্তু সেনাসদস্যরা উক্ত ৪ জনকে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মারধর করতে শুরু করে। অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি দেখে স্থানীয় গ্রামবাসীরা সেনা নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য সেখানে ছুটে যায়। গ্রামবাসীদের অনুরোধ সত্ত্বেও সেনাসদস্যরা আটককৃতদের ছেড়ে দেয়নি। এরপর সেনাসদস্যরা আটককৃতদের জোন হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে তাদের হাতে দেশী বন্দুক গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে নেয় এবং ব্যাপক মারধরের পর মিথ্যা অস্ত্র মামলায় জড়িয়ে পানছড়ি থানায় সোপর্দ করে।

উল্লেখ্য, আটককৃত ৪ জনের হাতে যে অস্ত্রটি গুঁজে দিয়ে ছবি তোলা হয়, সেনাসদস্যরা সেটা ঐদিন বিকাল আনুমানিক ৩:০০ টায় ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র ক্যাডার তেজোদীপ্ত চাকমা ওরফে হ্যাপী, সাং তারবন্যা, পানছড়ির কাছ থেকে সংগ্রহ করে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছে। এরপরই সেনাসদস্যরা উক্ত ৪ জনকে আটক করে।

লংগদুতে সেনাসদস্যদের নির্যাতনে ৪ জুম্ম মারাত্মক আহত

বিগত ২৮ নভেম্বর ২০০৫ দিবাগত রাত ১২টায় লংগদু উপজেলার মাইনী সেনা জোন নিয়ন্ত্রিত করল্যাছড়ি সাবজোনের কমান্ডার লে. মেহেদীর (২৬ বেঙ্গল) নেতৃত্বে একদল সেনা জওয়ান বামে আটরকছড়া গ্রামে নিরীহ এলাকাবাসীর উপর নির্বিচার হামলা ও নির্যাতন চালিয়েছে। এতে কিশোর চাকমা এলিশন (৩১) পিতা কালিরতন চাকমা, দীপংকর চাকমা (৩৮) পিতা কালিরতন চাকমা, কিরণময় চাকমা (৩০) পিতা বিমলেন্দু চাকমা ও শ্যামল চাকমা (২২) পিতা আপন বিহারী চাকমা প্রমুখ ৪ গ্রামবাসী মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, লে. মেহেদীর নেতৃত্বে সেনা জওয়ানরা দু'গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথমে এলিশন চাকমার বাড়ী ঘেরাও করে তাকে রশি দিয়ে বেঁধে মারধর করে। এসময়ে পার্শ্ববর্তী বাড়ী হতে তার বড় ভাই দীপংকর চাকমা খোঁজ নিতে এলে তাকেও রশি দিয়ে বেঁধে বেচড়ক মারধর করা হয়। শুধু তাই নয়, তার বাড়ী তল্লাশী চালানোর সময়ে সেনা জওয়ানরা ৪৯৯০ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। অপর গ্রুপটি কিরণময় চাকমার বাড়ী ঘেরাও করে। সেনা জওয়ানরা দরজা ভেঙে বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং বেদম নির্যাতন চালায়। এক পর্যায়ে সেনা জওয়ানরা তাকে ও তার বাড়ীতে অবস্থানরত শ্যালক শ্যামল চাকমাকে হাত-পা ও চোখ বেঁধে মারধর করে। পরে সবাইকে এলিশন চাকমার বাড়ীতে জড়ো করে প্রায় ৪ ঘন্টা ধরে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। ভোর হওয়ার সময়ে কোনরূপ কারণ উল্লেখ না করে তাদেরকে শাসিয়ে যায় যে, একবারের মতো তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে আবারও এধরনের নির্যাতন চালানো হবে বলে হুমকি দিয়ে যায়।

নানিয়ারচরে ইউপিডিএফ কর্তৃক দুই ব্যক্তি অপহরণের পর খুন

গত ২৯ নভেম্বর ২০০৫ রাত প্রায় ৮:০০ টায় ইউপিডিএফের একটি সশস্ত্র দল রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর উপজেলাধীন খুল্যাঙপাড়া গ্রামের বিমল চাকমা (৪০) পীং মহেশ চন্দ্র চাকমা ও কুকুরমারা গ্রামের যতিন বিকাশ চাকমা, পীং অমলেন্দু চাকমাকে উপজেলার কুকুরমারা গ্রাম থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। পরে অমানুষিক নির্যাতনের পর তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। হত্যার পর তাদের লাশও ফেরত দেয়নি বলে নিহত আত্মীয়রা জানিয়েছে। উল্লেখ্য বিমল চাকমা জনসংহতি সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য। এর আগে ২০০০ সালের ৬ নভেম্বর তার ছোট ভাই সতিশ চন্দ্র চাকমাকে একইকায়দায় অপহরণের পর হত্যা করে।

নানিয়ারচরে ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্য নিহত

গত ৯ ডিসেম্বর ২০০৫ ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র একটি দল রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর উপজেলাধীন দেওয়ানচর এলাকার প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্য শান্তি রঞ্জন চাকমা পীং- জ্ঞান রঞ্জন চাকমাকে তার বাড়ী হতে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং পরে হত্যা করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে শান্তি রঞ্জন চাকমা উক্ত দেওয়ানচর এলাকায় বসবাস শুরু করে এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউপিডিএফের জিঘাংসার ছোবল থেকে নিরীহ শান্তি রঞ্জন চাকমা রেহাই পায়নি।

বাঘাইছড়িতে বিডিআর কর্তৃক দুই জুম্ম গ্রামবাসী নির্যাতিত

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০০৫ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বগাচতর ইউনিয়নের নলুয়া গ্রামের সুশীল বিন্দু চাকমা (২২) পীং রঞ্জন কুমার চাকমা এবং বিজয় শান্তি চাকমা (৩২) পীং পুনং চান চাকমা নামে দুই নিরীহ গ্রামবাসী স্থানীয় বিডিআর ক্যাম্পের (১২ ব্যাটেলিয়ন) হাবিলদার আশরাফের নেতৃত্বে একদল বিডিআর কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। উক্ত দুই জুম্ম নিজেদের বাড়ী নির্মাণকালে বিডিআর সদস্যরা সেখানে পৌঁছলে কোন কারণ ছাড়াই মারধর শুরু করে।

মানিকছড়ি সেটেলার বাঙালীর হামলায় একজন জুম্ম বিক্রেতা নিহত

গত ২২ ডিসেম্বর ২০০৬ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার মহামুনি বাজারে মংহলাগ্য মারমা (৫৫) নামে একজন জুম্ম সেটেলার বাঙালীদের সংঘবদ্ধ হামলায় নিহত হয়। জানা গেছে যে, সেদিন বিকাল আনুমানিক ৫.৩০টায় মংহলাগ্য মারমা বাজার করার উদ্দেশ্যে মহামুনি বাজারে যায়। বাজার থেকে ফেরার পথে আনুমানিক রাত ৮.৪৫ ঘটিকায় মহামুনি তালতলা বাবুলের দোকানের সামনে পৌঁছলে পূর্ব মহামুনি পাড়ার হোসেন মিস্ত্রী (৫০) পিতা সাখাওয়াত উল্লাহ, শাহাদাৎ হোসেন (২২) পিতা হোসেন মিস্ত্রী, মোঃ মাহাবুবুর রহমান (২৩) পিতা অলি আহম্মদ প্রমুখ সেটেলারদের সাথে মুলা ক্রয় করার বিষয় নিয়ে মংহলাগ্য মারমার কথা কাটাকাটি হয়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উক্ত সেটেলার বাঙালীরা কাঠের বাট দিয়ে মংহলাগ্য মারমার মাথায়, কানে, মুখে ও বুকে সজোরে আঘাত করে। এতে গুরুতর জখম হয়ে প্রচন্ড রক্তক্ষরণের কারণে মংহলাগ্য মারমা সেখানে লুটিয়ে পড়ে। এ সময় তার আত্মীয় পূর্ব মহামুনি পাড়ার বাসিন্দা রুইলাচাই মারমা (৪৫) পিতা উচাই মারমা এগিয়ে এলে সেটেলার বাঙালীরা পালিয়ে যায়। এরপর মংহলাগ্য মারমাকে মানিকছড়ি হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করে। মংহলাগ্য মারমার ছেলে থৈঅংগ্য মারমা বাদী হয়ে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে।

কাউখালীতে পুলিশ কর্তৃক ৩ নিরীহ জুম্ম গ্রেফতার

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৫ চট্টগ্রাম জেলাধীন রাঙ্গুনিয়া থানার পুলিশ মিথ্যা অভিযোগে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী উপজেলাধীন মঘাছড়ি এলাকা হতে ৩ নিরীহ জুম্মকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত ৩ জুম্ম হল- অংগ্য প্রু মারমা (৩২) পীং প্রয়াত রুয়েচাই মারমা; চিংকিউ মারমা (২৮) পীং চিং থোয়াই মারমা ও খ্যানিং অং মারমা (২০) পীং মং থুয়ে মারমা।

জানা যায়, গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০৫ মতিউর রহমান ওরফে পাক্যা (৫০) নামের জনৈক বাঙালী মঘাছড়ি দোকান হতে খামার বাড়ীতে ফেরার পথে অজ্ঞাতনামা দৃস্কৃতিকারী কর্তৃক খুন হয়। দুস্কৃতিকারীরা মতিউরকে হত্যার পর নিহতের লাশ পাশ্ববর্তী মারমা গ্রামে যাওয়ার পথে রেখে দেয়। এটা দেখেই রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে একদল পুলিশ স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে উক্ত মারমা গ্রামে যায় এবং ৭ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত ৭ জনের মধ্যে ৪ জনকে ছেড়ে দিয়ে উপরোক্ত ৩ জনকে মিথ্যাভাবে মতিউর রহমান হত্যা মামলায় জড়িত করে জেলহাজতে পাঠানো হয়। অপরদিকে এই হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঘাছড়ি এলাকার বাঙালী নেতৃবৃন্দ যেমন- ইউপি চেয়ারম্যান আলম, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল আলম মারমারা যাতে তাদের জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় সেই উদ্দেশ্যে মারমা গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়ার জন্য নিহতের আত্মীয়দের নানা উস্কানী দিয়ে চলেছে। এমনকি রফিক (৩৫), মোঃ সিরাজ মিঞা (৫০), শামসুল আলম (৩২) পীং মোঃ সিরাজ মিঞার নেতৃত্বে বাঙালী গ্রামবাসীরা মারমা গ্রামে হামলারও চেষ্টা চালায়।

পানছড়ি জোন কমান্ডার মেজর নাসিমের নির্যাতনের শিকার নিরীহ গ্রামবাসী

গত ৩ জানুয়ারী ২০০৬ আনুমানিক রাত প্রায় ১০:৩০ টায় খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি জোনের কমান্ডার মেজর নাসিম খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন দেওয়ানপাড়া এলাকার ৩ গ্রামবাসীকে নৃশংসভাবে মারধর করে আহত করে। আহত ৩ গ্রামবাসী হলেন- (১) সিন্ধু কুমার চাকমা (৪২) পীং দয়াল কুমার চাকমা, অরুন বিকাশ দেওয়ান (২৭) পীং উমাকান্ত দেওয়ান ও বিভা দেওয়ান (২২) পীং উমাকান্ত দেওয়ান।

জানা যায়, ঐ দিন মেজর নাসিম ভাইবোনছড়া ক্যাম্পে আসেন এবং সারারাত সেখানে অবস্থান করেন। ক্যাম্পে অবস্থানকালে মেজর নাসিম সিন্ধু কুমার চাকমাকে গ্রেফতার করতে ভাইবোনছড়া ক্যাম্প হতে একদল সেনাসদস্য পাঠান। সেনাসদস্যরা সিন্ধু কুমার চাকমাকে ভাইবোনছড়া ক্যাম্পে ধরে নিয়ে আসলে মেজর নাসিম নৃশংসভাবে নির্যাতন চালান। এরপর সেনাসদস্যরা অরুন বিকাশ দেওয়ান ও বিভা দেওয়ানকে তাদের বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে আসে এবং মেজর নাসিমের নেতৃত্বে তাদেরকেও মারাত্মকভাবে মারধর করা হয়। মেজর নাসিম অরুন বিকাশ দেওয়ান ও বিভা দেওয়ানকে তাদের বাবাকে তার সামনে হাজির করতে বলে, নাহলে গ্রাম ছাড়তে হবে বলে উল্লেখ করে। উল্লেখ্য, অরুন বিকাশ দেওয়ান ও বিভা দেওয়ান এর পিতা উমাকান্ত দেওয়ান জনসংহতি সমিতি-র একজন প্রত্যাগত সদস্য। এ সময় তিনি রাঙ্গামাটিতে চিকিৎসার জন্য অবস্থান করছিলেন।

অপরদিকে ৪ জানুয়ারী ২০০৬ সকাল আনুমানিক ৭:০০ টায় ভাইবোনছড়া ক্যাম্প হতে জোন হেডকোয়ার্টার-এ ফেরার সময়ও মেজর নাসিম কলেজ গেইট এলাকায় আরও দুই জুম্মকে নির্যাতন চালায়। তারা হলেন- (১) অপু চাকমা (৪০) পীং কামেশ চন্দ্র চাকমা (তিনি জনসংহতি সমিতির পানছড়ি শাখার সাধারণ সম্পাদক) ও (২) বিনয় চাকমা (২৮) পীং মৃত সুকোমল চাকমা।

লক্ষীছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক এক গ্রামবাসীকে হত্যা ও অন্যদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায়

গত ৮ জানুয়ারী ২০০৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন লক্ষীছড়ি উপজেলায় ইউপিডিএফের সশস্ত্র ক্যাডাররা যুদ্ধমোহন চাকমা (৩০) পীং ব্রেজ চাকমা নামে এক নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণের পর হত্যা করে। জানা যায়, ঐদিন প্রায় মধ্যরাতে রতনবসু চাকমা ওরফে জয় (৩০) পীং দুলালবসু চাকমা, সাং দিল্যাতলী ও লক্ষী চাকমা লিটন (২৮) পীং মৃত তরুনী মোহন চাকমা, সাং গোলাছড়ি-এর নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-এর একটি সশস্ত্র দল লক্ষীছড়ি উপজেলাধীন বেঙমারা গ্রামে অভিযান চালায়। এ সময় তারা জনসংহতি সমিতির সদস্য কালাবরণ চাকমাকে খোঁজ করে এবং যুদ্ধমোহন চাকমা (২৫) পীং ব্রেজ চাকমা ও রত্ন কুমার চাকমা লাজ্যা (২৬) পীং মৃত শান্তি চাকমা নামের দুই নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। পরদিন ইউপিডিএফ সদস্যরা কয়েকজন গ্রামবাসীর সামনে একই গ্রামের বটতলা নামক স্থানে অপহৃত রত্ন কুমার চাকমা লাজ্যাকে হত্যা করে এবং তার লাশ সৎকার করতে গ্রামবাসীদের নির্দেশ দেয়। অপরদিকে অপহৃত যুদ্ধমোহন চাকমাকে আরও প্রত্যন্ত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার মুক্তির জন্য ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবী করা হয়। পরে মুক্তিপণ দিয়ে অপহৃত যুদ্ধমোহন চাকমাকে তার আত্মীয়-স্বজনরা উদ্ধার করে।

অপরদিকে ১১ জানুয়ারী ২০০৬ ইউপিডিএফ-এর একই দল আবার বেঙমারা গ্রামে হানা দেয়। এসময় তারা মিসেস জলি চাকমা (৫০) স্বামী মৃত শান্তি চাকমাকে বেদম প্রহার করে। উল্লেখ্য, মিসেস জলি চাকমা হত্যার শিকার রত্ন কুমার চাকমা লাজ্যার মা ও স্থানীয় জনসংহতি সমিতির সদস্য কালাবরণ চাকমার শাশুড়ী। ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা মিসেস জলি চাকমাকে তার জামাতা কালাবরণ চাকমাকে তাদের সামনে হাজির করতে নির্দেশ দেয়। অন্যথায় ৩ লক্ষ টাকা দিতে হবে বলে জানিয়ে দেয়। আবারও আক্রমণের ভয়ে জলি চাকমা এরপর গ্রাম ছাড়ে। এদিকে পাশ্ববর্তী ভিজাকিজিং এলাকার শান্তি চাকমা নামে এক গ্রামবাসী ইউপিডিএফ-এর এই অমানবিক কাজের প্রতিবাদ করলে সন্ত্রাসীরা তার উপরও চড়াও হয়। সন্ত্রাসীরা শান্তি চাকমার বাড়ীও ঘেরাও করে। বাড়ীতে শান্তি চাকমাকে না পেয়ে তারা শান্তি চাকমার স্ত্রীকেই বেদম প্রহার করে। আর শান্তি চাকমার স্ত্রীকে বলে যে, যতদিন পর্যন্ত শান্তি চাকমাকে তাদের সামনে হাজির করা না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শান্তি চাকমার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ইউপিডিএফ-এর কাছে বাজেয়াপ্ত থাকবে।

মহালছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্ম গ্রামে হামলা

গত ১৪ জানুয়ারী ২০০৬ আনুমানিক সন্ধ্যা ৭:৩০ টায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার জামতলী গুচ্ছগ্রামের সেটেলার বাঙালীরা পার্শ্ববর্তী জুম্ম অধ্যুষিত কালোপাহাড় এলাকা ও জামতলা গ্রামে হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকটি জুম্ম বাড়ী তছনছ ও লুটপাট করেছে। তন্মধ্যে পশ্চিম কেয়াংঘাটের কালো পাহাড় এলাকা দিপান্ত চাকমা পীং নিশি কুমার চাকমার বাড়ীর ১টি সেলাই মেশিন, দুই ব্যাগ মূল্যবান কাপড়, নগদ ৪৫০০ টাকা, দুটি কম্বল, ২৭ কেজি চাল লুটপাট করা হয় এবং বাড়ীটি ভেঙে দেয়া হয়। একই গ্রামের বোধিপ্রিয় চাকমা পীং নন চাকমার বাড়ী হতে ১টি ৬ ইঞ্চি সাদা-কালো টেলিভিশন, নগদ ১২০০ টাকা, ৪টি কম্বল, ১টি দেয়াল ঘড়ি, ১৫ কেজি চাল, এছাড়া কাপড়-চোপড় লুটপাট করা হয় এবং বাড়ীটি ধ্বংস করা হয়। জামতলী গ্রামের নীহারিকা চাকমার বাড়ী হতে ১টি ১৪ ইঞ্চি সাদাকালো টেলিভিশন, ড্রেসিং টেবিলের গ্লাস, ১টি টেবিল ঘড়ি ও ১টি ১২ ভোল্ট ব্যাটারী লুটপাট করা হয়। একই গ্রামের বাসনা চাকমার বাড়ী হতে লুট হয় নগদ ১২০০ টাকা।

জানা যায়, ঐদিন বিকাল আনুমানিক ৬:০০ টায় অজ্ঞাতনামা কয়েকজন দুস্কৃতিকারী মাইসছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো: জসিমকে তার তিন সহযোগীসহ মোটর সাইকেল সহযোগে খাগড়াছড়ি সদর হতে বাড়ী ফেরার পথে থামাতে চেষ্টা করে। দুস্কৃতিকারীরা জসিমকে থামাতে ব্যর্থ হলেও তার মাথায় আঘাত করে। এরপর মাথায় সামান্য আহত জসিম গুচ্ছগ্রামে পৌঁছতে সক্ষম হয়। গুচ্ছগ্রামে পৌঁছা মাত্রই জসিম চিৎকার করে বলতে থাকে যে, 'আমাকে সাহায্য কর, আমাকে সাহায্য কর, জুম্মরা কালাপাহাড় এলাকায় বাঙালীদের উপর আক্রমণ করেছে।' এ খবর শোনার পরই অন্যান্য বাঙালীরাও মাইকে ঘোষণা করতে থাকে যে, 'সবাই এগিয়ে আসো, জুম্মরা বাঙালীদেরকে আক্রমণ করেছে।' কোন প্রকার খোঁজখবর না নিয়ে অন্যান্য সেটেলার বাঙালীরাও ধারালো অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয় এবং জুম্ম অধ্যুষিত জামতলা ও কালাপাহাড় এলাকায় আক্রমণ করে। এতে জুম্মরা প্রাণে বেঁচে গেলেও তাদের ঘরবাড়ী লুটপাট ও ধ্বংস করা হয়।

বিলাইছড়িতে নিরীহ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে বন কর্মকর্তাদের মামলা দায়ের

গত ২১ জানুয়ারী ২০০৬ বিলাইছড়ি উপজেলাধীন আলিক্ষং রেঞ্জ কর্মকর্তা, সাক্রাছড়ি ষ্টেশন অফিসার ও ধুপশীল বিট কর্মকর্তার উদ্যোগে ভোটার তালিকা থেকে নাম সংগ্রহ করে স্থানীয় জুম্ম অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ২৯টি হয়রানিমূলক বন মামলা দায়ের করা হয়। বন বিভাগের উক্ত কর্তকর্তারা বদলী হয়ে যাওয়ার সময় উক্ত মামলাগুলি দায়ের করা হয় বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে বিডিআর কর্তৃক জোরপূর্বক অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ভিডিও ছবি রেকর্ডিং

গত ২১ জানুয়ারী ২০০৬ বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ৪০ ব্যাটালিয়ন নাইক্ষ্যংছড়ি বিডিআর ক্যাম্পের মেজর আব্দুল আওয়াল ২ জন জুম্ম ও ২ জন বাঙালীকে ক্যাম্পে ডেকে পাঠান এবং তাদের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে জোরপূর্বক ভিডিও রেকর্ডিং করেন। ভিডিও রেকর্ডিং-এ দুই জুম্মকে 'উপজাতীয় দুস্কৃতিকারী' ও দুই বাঙালীকে 'রোহিঙ্গা দুস্কৃতিকারী' হিসেবে তুলে ধরা হয়। ছবি তোলার পর তাদের প্রত্যেককে ২০০ টাকা করে বকশিশ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। জোরপূর্বক ভিডিও রেকর্ডিং-এর শিকার উক্ত দুই জুম্ম হল- দৌছড়ি ইউনিয়নের ধুংরি হেডম্যান পাড়ার চাইলাং অং মারমা (৫০) পীং মৃত মংখ্যইরী মারমা ও মংচা হ্লা মারমা এবং দুইজন বাঙালী হলো দৌছড়ি ইউনিয়নের মোঃ মোক্তার আহমদ ও মোঃ জাফর।

নাইক্ষ্যংছড়িতে বিডিআর কর্তৃক জুম্মদের মারধর

গত ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ দুপুর ১২টায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার দোছড়ি ইউনিয়নের ছাগলখাইয়া বিডিআর ক্যাম্পের লেঃ আনিসের নেতৃত্বে একদল বিডিআর দারগু ও ক্রোক্ষ্যং মৌজায় সন্ত্রাসী তল্লাসীর নামে এক অভিযান চালায়। অভিযান চলাকারে বিডিআর সদস্যরা ফোরখান কার্বারী (৪০) পীং ক্যরুই ম্রো, ভুলু ম্রো (৩৫) পীং অংদো ম্রো, চিংক্রা ম্রো (২৫) পীং রেইঞো ম্রো ও ক্রংদো ম্রো (৩০) প্রমুখ গ্রামবাসীদেরকে বেদম মারধর করে।

খাগড়াছড়িতে আদালত প্রাঙ্গনে আসামীদের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক ছবি তোলা

গত ৫ মার্চ ২০০৬ আনুমানিক ৩.০০ ঘটিকার সময় খাগড়াছড়ি কগনিজেন্স আদালত চলাকালীন সময়ে সেনাবাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেন জাহিদ-এর নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য আদালত আঙ্গিনায় প্রবেশ করে আদালতের কোন প্রকার আদেশ ব্যতীত এডভোকেট সুপাল চাকমার সেরেস্তার মামলা নং জি, আর- ৪৫/০৬ এর আসামী (১) সুশীল কান্তি চাকমা ও (২) কমলা রঞ্জন চাকমাকে পুলিশ কাস্টডি হতে বের করে এবং সেনা সদস্যরা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসা একটি আগ্নেয়াস্ত্র উল্লেখিত ব্যক্তিদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছবি তুলে নেয়। ছবি তোলার পর উক্ত আগ্নেয়াস্ত্রটি সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের হেফাজতে নিয়ে যায়। আদালত কাস্টডিতে এই নজিরবিহীন ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণও স্তম্ভিত হন।

উল্লেখ্য যে, গত ৪ মার্চ ২০০৬ রাত আনুমানিক ১১.০০ টা হতে রাত ১.০০ টার মধ্যে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার বিজিতলা সাবজোন ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার মেজর বশির আহমেদের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য (১) কমলা রঞ্জন চাকমা (৪৫) পীং মৃত বুদ্ধমুনি চাকমা, গ্রাম বিজিতলা, (২) প্রীতি জীবন চাকমা (৩০) পীং চিড়িং চাকমা, গ্রাম ২নং প্রকল্প গ্রাম, (৩) অংক্য মারমা (৩০) পীং নিচাই মারমা, গ্রাম ২নং প্রকল্প গ্রাম, (৪) কল্প মারমা (৩৩) পীং পটু মারমা, গ্রাম ২নং প্রকল্প গ্রাম, (৫) বাঁশি চাকমা পীং সুরেন্দ্র চাকমা, গ্রাম রাবার বাগান ও (৬) সুশীল চাকমা বনমালী (৪৬) পীং হরিশ্চন্দ্র চাকমা, গ্রাম রাবার বাগানকে স্ব স্ব বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে আসে এবং নির্মমভাবে মারধর করে। সেনাসদস্যদের প্রহারে মারাত্মক আহত সুশীল চাকমাকে (৪৬) খাগড়াছড়িতে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। শুধু মারধর করেই সেনাসদস্যরা ক্ষান্ত থাকেনি, উপরন্তু প্রহৃত ব্যক্তিদের মিথ্যাভাবে অস্ত্র মামলায় জড়িত করে জেলহাজতে প্রেরণ করে।

আরো উল্লেখ্য যে, গত ২৯ জানুয়ারী থেকে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় মাইসছড়ি নুনছড়ি গুচ্ছগ্রামের সেটেলার বাঙালীরা প্রায় অর্ধ শতাধিক বাড়ী নির্মাণ করে গামারীঢালা, কাটিংছড়ি, লেমুছড়ি, বৌদ্ধশিশুঘর এলাকায় জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জায়গাজমি জবরদখল করে। উক্ত ভূমি বেদখল বন্ধকরণ ও অবৈধ বসতবাড়ী উচ্ছেদের দাবীতে স্থানীয় অধিবাসীরা প্রথম দফায় ৬ ফেব্রুয়ারী এবং দ্বিতীয় দফায় ১২ ফেব্রুয়ারী থেকে মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি সড়ক অবরোধ কর্মসূচী পালন করে। সেটেলার বাঙালী কর্তৃক নির্মিত ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দেয়া হবে মর্মে সেনা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের আশ্বাসের ভিত্তিতে স্থানীয় অধিবাসীরা সড়ক অবরোধ কর্মসূচী তুলে নেয়। কিন্তু সেটেলার বাঙালীদের ঘরবাড়ী তুলে নেয়ার পরিবর্তে আরো ঘরবাড়ী নির্মাণ করে বসতিস্থাপন করতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে স্থানীয় অধিবাসী ও খাগড়াছড়ি জেলা নাগরিক কমিটির উদ্যোগে ৬ মার্চ ২০০৬ থেকে খাগড়াছড়ি জেলাব্যাপী অনির্দিষ্ট কালের জন্য সড়ক অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। উক্ত কর্মসূচী ভন্ডুল করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী স্থানীয় অধিবাসীদের উপর এহেন ন্যাক্কারজনক ধর-পাকড়, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে মিথ্যা অস্ত্র মামলা দায়ের, ঘরবাড়ী তল্লাসী ইত্যাদি হয়রানিমূলক কর্মকান্ড শুরু করেছে। গামারীঢালা ছাড়াও দীঘিনালার মেরুং, পানছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল করে চলেছে।

লেমুছড়ির তিন গ্রামবাসীকে সেনাবাহিনী কর্তৃক ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে মারধর

গত ৭ মার্চ ২০০৬ গভীর রাতে মহালছড়ি সেনা জোনের জোন কম্যান্ডার লেঃ কঃ সামস্-এর নির্দেশে একদল সেনা সদস্য মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি ইউনিয়নের লেমুছড়ি আদামের নিবা রতন চাকমা, শান্তি মণি চাকমা ও ননাক্যা চাকমাকে রাত্রে বাড়ীতে ঘুমানোর সময় ধরে নিয়ে এসে বেদম মারধর করে। উল্লেখ্য যে, মাইসছড়ি ও গামারীঢালা এলাকায় সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের জমি জবরদখলের প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণ সড়ক অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচী

পালন করে আসছিল। প্রতিবাদী গ্রামবাসীদের দমনের জন্য সেনাবাহিনী এভাবে সাধারণ মানুষের উপর ধর-পাকড় চালিয়ে আসছে।

কাউখালীর ঘাগড়ায় সেটেলার বাঙালীদের কর্তৃক জুম্ম গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা

গত ২৩ মার্চ ২০০৬ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের যৌথখামার এলাকার জুম্মদের উপর একদল সেটেলার বাঙালী সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়েছে। হামলায় ৮ জন জুম্ম ও হামলাকারী আহত হয় এবং জুম্মদের বেশ কিছু ঘরবাড়ী লুটপাট ও ধ্বংস করা হয়। উল্লেখ্য, ঐদিন আনুমানিক রাত ৯.৩০ টায় চট্টগ্রাম জেলাধীন রাঙ্গুনিয়া থানার মঘাছড়ি এলাকার বাসিন্দা মোঃ রফিক (৩০) পিতা আবদুল সালাম নামের জনৈক ব্যক্তি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের যৌথ খামার পাড়ায় মদ্য পান করতে যায়। মদ্য পান শেষে ফেরার সময় উক্ত মোঃ রফিক যৌথখামার পাড়ারই রাজেশ্বরী চাকমা (৪০) স্বামী মৃত ধেঙা চাকমাকে পথিমধ্যে একা পেয়ে শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে ঝাপটে ধরার চেষ্টা করে। আতঙ্কিত রাজেশ্বরী চাকমা তৎক্ষণাৎ চিৎকার শুরু করলে আশেপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় এবং মোঃ রফিককে ধরে তাড়িয়ে নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দিয়ে আসে।

এর কয়েক মিনিট পরেই মোঃ রফিক রাস্তায় দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাঙ্গামাটি থেকে একটি ট্রাক এসে পড়লে ট্রাকের গতি রোধ করে ট্রাকে অবস্থানকারী প্রায় ২০/২৫ জন বাঙালীকে উস্কানীমূলকভাবে বলে যে, পাহাড়ী সন্ত্রাসীরা এই মুহূর্তে আমার কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। এসময় সবাই উত্তেজিত হয়ে ট্রাক থেকে নেমে যৌথখামার পাড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অপরদিকে ট্রাক চালকও সাথে সাথে ট্রাকটি নিয়ে মঘাছড়ির দিকে যায় এবং সেখান থেকে ২টি ট্রাকে ও ১টি জীপে করে আরও বাঙালী নিয়ে আসে। এভাবে তারা সবাই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে পাহাড়ী অধ্যুষিত যৌথ খামার পাড়ায় হামলা শুরু করে। হামলার মুখে পড়া পাহাড়ীরাও আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে উভয়পক্ষের মারপিট লেগে যায়। এসময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও অপ্রস্তুত পাহাড়ীদের অনেকেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, হামলা শুরু হওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি পাশ্ববর্তী ডাকবাংলাস্থ আর্মড পুলিশ ব্যাটিলিয়ন ক্যাম্পে ঘটনাটি অবহিত করেন। এর পরপরই উক্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটিলিয়ন ও পাশ্ববর্তী ঘাগড়া জোনের সেনাসদস্যরা ঘটনাস্থলে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

এ হামলায় ৩নং ঘাগড়া ইউনিয়নের যৌথখামার পাড়ার (১) ললিত কুমার চাকমা (৪৫) পীং মৃত লবঙ্গ চাকমা, (২) সজিব চাকমা (৩৫) পীং মৃত কালী কুমার চাকমা, (৩) বিজয় শোভা চাকমা (৩৩) পীং কিনারাম কার্বারী, (৪) রাঙাচান চাকমা (৬৫) পীং মৃত ফাগারা চাকমা, (৫) বিজয় চাকমা (২০) পীং রাজকুমার চাকমা, (৬) রবিধন চাকমা (৩৫) পীং মন চাকমা, (৭) শান্তি জয় চাকমা (৩৫) পীং অগ্নিমোহন চাকমা ও (৮) ধনাইয়া দেওয়ানজী (১৯) পীং রতন দেওয়ানজী এবং মদ্যপানকারী মোঃ রফিক প্রমুখ ব্যক্তি আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ললিত কুমার চাকমা ও মোঃ রফিককে গুরুতর আহত অবস্থায় রাঙ্গামাটি সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া হামলার সময় হামলাকারীরা বেশ কয়েকজন পাহাড়ীর মজুতকৃত ছন পুড়ে দেয়, বাড়ীর জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় এবং মজুতকৃত প্রায় আট হাজার টাকার বাঁশ ও খুঁটি লুট করে নিয়ে যায়।

লংগদুতে সেনা অভিযানে ১৬ নিরীহ জুম্ম গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার

গত ২৮ এপ্রিল ২০০৬ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার মাইনীমুখ সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য লংগদু উপজেলাধীন আটরকছড়া ইউনিয়নের যাত্রামুড়া গ্রামে সকাল ৬টা হতে ১০টা পর্যন্ত সামরিক অভিযান চালিয়ে ১৬ জন নিরীহ জুম্মকে গ্রেফতার ও ব্যাপক নির্যাতন চালিয়েছে। গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার জুম্মরা হল- (১) স্মৃতি বিকাশ চাকমা পীং কাঞ্চন কুমার চাকমা, (২) বাবুল চাকমা পীং শান্তিমনি চাকমা, (৩) সবিনয় চাকমা পীং বিনন্দ চাকমা, (৪) বিনিময় চাকমা পীং স্মৃতি বিকাশ চাকমা, (৫) শান্তিমনি চাকমপ পীং স্মৃতি বিকাশ চাকমা, (৬) বাবুল্যা চাকমা পীং স্মৃতি বিকাশ চাকমা, (৭) শান্তি বিকাশ চাকমা পীং তরণীসেন চাকমা, (৮) ভাগ্য চাকমা পীং নিলসেন চাকমা, (৯) তপন চাকমা পীং জঙ্গী পিস্টা চাকমা, (১০) স্বপন বিকাশ চাকমা পীং জঙ্গী পিস্টা চাকমা, (১১) রবিশংকর চাকমা পীং উক্কপেডা চাকমা, (১২) বিনন্দ চাকমা পীং রাজামনি চাকমা, (১৩) সুনেন্টু চাকমা পীং বিনন্দ চাকমা, (১৪) গুনেন্টু চাকমা পীং বিনন্দ চাকমা, (১৫) নিলবরণ চাকমা পীং হৃদয়বাপ চাকমা ও (১৬) আমেরিকা চাকমা পীং অনন্ত বিজয় চাকমা। পরে সেনাসদস্যরা প্রথম চারজনকে মিথ্যাভাবে অস্ত্র মামলায় জড়িত করে লংগদু থানায় সোপর্দ করে এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেয়।

মহালছড়ির লেমুছড়িতে সেনাসদস্যদের কর্তৃক নিরীহ জুম্ম গ্রেফতার ও নির্যাতন

গত ৪-৫ মে ২০০৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার মহালছড়ি সেনা জোনের অধীন কেয়াংঘাট সাব-জোনের জনৈক মেজরের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য লেমুছড়ি গ্রামের এক দোকান থেকে ৬ নিরীহ জুম্মকে গ্রেফতার করে। এরপর গ্রেফতারকৃতদের মহালছড়ি সেনা জোনে পাঠানো হয় এবং সেখানে শারিরীকভাবে নির্যাতন চালানো হয়। গ্রেফতারকৃত ও নির্যাতিতরা হলো- লেমুছড়ি গ্রামের সোনারতন চাকমা (৩৮) পীং প্রয়াত সুভাষ চন্দ্র চাকমা; হৃদয় বিন্দু খীসা (৩২) পীং

সত্যরঞ্জন চাকমা; অসীম বরণ তালুকদার (৪৭) পীং মৃত মুকুন্দ লাল তালুকদার; প্রীতি বিন্দু তালুকদার (৩০) পীং নবদীপ তালুকদার; সন্তু চাকমা (২২) ইন্দুময় চাকমা ও প্রদীপ চাকমা (১৮) পীং রেবতী মোহন চাকমা।

স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চাপে ও মাইসছড়ি ইউপি চেয়ারম্যানের দাবীর মুখে পরে গ্রেফতারকৃত ৬ জনের মধ্যে ৫ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়। তবে সোনারতন চাকমাকে মিথ্যাভাবে অস্ত্র মামলায় জড়িত করে মহালছড়ি থানায় সোপর্দ করা হয়। উল্লেখ্য, পুলিশের কাছে সোপর্দ করার পূর্বে সেনা কর্তৃপক্ষ সোনারতনের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে একটি ছবি তুলে নেয়।

পানছড়িতে সেনাসদস্যদের কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্য গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার

গত ৭ মে ২০০৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন পানছড়ি উপজেলায় পানছড়ি সেনা জোনের জনৈক সেনা গোয়েন্দা মোঃ বেলাল কোন ওয়ারেন্ট ছাড়াই পানছড়ি উপজেলার নালকাটা গ্রামের বাসিন্দা বুদ্ধরঞ্জন চাকমা ওরফে কুসুম (৪০) পীং গন্ধরাজ চাকমাকে পানছড়ি বাজার হতে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পরপরই পানছড়ি জোনের মেজর নাসিমের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য সেনাজোনে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধরঞ্জন চাকমাকে শারিরীকভাবে নির্যাতন চালায় এবং হাতে একটি বন্দুক গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে নেয়। পরের দিন মিথ্যাভাবে অস্ত্র মামলায় জড়িত করে সেনাসদস্যরা বুদ্ধরঞ্জন চাকমাকে পানছড়ি থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

পানছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক চিঠি দিয়ে চাঁদা আদায়

গত ৯ মে ২০০৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার দক্ষিণ নালকাটা গ্রামের ৮ গ্রামবাসীকে চিঠি দিয়ে ইউপিডিএফ দুদুকছড়াস্থ তাদের সামরিক ঘাটিতে উপস্থিত হতে বলে। উক্ত গ্রামবাসীরা হল- বীর চন্দ্র চাকমা (৪৫) পীং দীনবন্ধু চাকমা, কালি কুমার চাকম (৫০) পীং দীনবন্ধু চাকমা, ত্রিদিপ চাকমা (৪০) পীং ধর্মকান্ত চাকমা, বিনয় বিকাশ চাকমা (৩৫) পীং দেবেন্দ্র লাল চাকমা, শশী রঞ্জন চাকমা (৪৫) পীং শির চাকমা, কালেন্দ্র চাকমা (৪৫) পীং যামিনী চাকমা, স্নেহ কুমার চাকমা (৪০) পীং কালি মোহন চাকমা ও বসুদেব চাকমা (৩০) পীং শান্তি মোহন চাকমা।

উক্ত আট গ্রামবাসী ইউপিডিএফ-এর কথামত দুদুকছড়াস্থ তাদের সামরিক ঘাটিতে উপস্থিত হলে ইউপিডিএফের সদস্যরা তাদের কাছ থেকে চাঁদা দাবী করে। অন্যথায় তাদেরকে আটকে রাখা হবে বলে হুমকি দেয়। গ্রামবাসীরা ইউপিডিএফকে নগদ ৩০,০০০ টাকা দিলে আটকাবস্থা থেকে মুক্তি পায় এবং পরে আরো ৭০,০০০ টাকা দেবে বলেও অঙ্গীকার দিতে হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় ওয়াদুদ ভূঁইয়ার উল্লম্ফন

গত ২৯ মে ২০০৬ অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় ক্ষমতাসীন দলের সাংসদ, গডফাদার ও সাম্প্রদায়িক নেতা আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় এনজিওদের বিরুদ্ধে বিষোদাগার করেছেন। এনজিওদের বিরুদ্ধে তিনি 'উন্নয়নের' নামে 'সন্ত্রাসীদের অস্ত্র কেনার অর্থ যোগান' ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহকে ধর্মান্তরিতকরণের অভিযোগ এনেছেন। ইতোমধ্যে ৮০% ত্রিপুরা, ৬০% মারমা, ৪০% চাকমা ও ৯০% অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় তার এই ভিত্তিহীন ও বাস্তব-বিবর্জিত উল্লম্ফন উগ্র সাম্প্রদায়িকতারই বহিপ্রকাশ বৈ কিছু নয়। তার এই ছেলেমানুষী বক্তব্য তার রাজনৈতিক অপরিপক্কতা ও কুপকন্ডকতাকেই উন্মোচিত করেছে।

৮০% ত্রিপুরা, ৬০% মারমা, ৪০% চাকমা ও ৯০% অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিতকরণের অভিযোগ যেমনি ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত, তেমনি এনজিওদের উন্নয়নের নামে সন্ত্রাসীদের অস্ত্র কেনার অর্থ যোগানের অভিযোগও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বস্তুতঃ এনজিওদের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত করার রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যই তিনি এসব ভিত্তি ও কল্পনাপ্রসূত অভিযোগ এনেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।

বান্দরবানের আলীকদমে জনসংহতি সমিতির সম্মেলনে সেটেলার বাঙ্গালীদের হামলা

গত ১৯ জুন ২০০৬ বান্দরবান পার্বত্য জেলার আলীকদমে স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সেটেলার বাঙালীদের মৌলবাদী সংগঠন সম-অধিকার আন্দোলন-এর নেতা-কর্মিরা জনসংহতি সমিতির আলীকদম উপজেলা শাখার সম্মেলনে হামলা চালিয়েছে। লাঠিসোটা ও লোহার রডে সজ্জিত হয়ে আক্রমণকারী সেটেলাররা নিরস্ত্র জনসংহতি সমিতির কর্মি ও সমর্থকদের উপর হামলা চালিয়ে অন্তত ৩০ জনকে আহত করেছে। তন্মধ্যে ৬ জনের অবস্থা গুরুতর। ঐদিন সকাল প্রায় ১১টায় আলীকদম উপজেলা সদর টাউনহলে জনসংহতি সমিতির সম্মেলন শুরুর প্রাক্কালে আলীকদম সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালামের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ সেটেলার বাঙালী সাম্প্রদায়িক শ্লোগান তুলে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা টাউনহলের চেয়ার, টেবিল, দরজা, জানালা ভেঙে দেয়। এরপর তারা সম্মেলন উপলক্ষে টাউনহলের সামনে উত্তোলিত জাতীয় পতাকা ও জনসংহতি সমিতির দলীয় পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়। হামলায় জনসংহতি সমিতির নিম্নোক্ত কর্মি ও সমর্থকগণ আহত হন-

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩০ টাকা মাত্র

JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS)

Issue No-36, 16th Year, 9 August 2006

Published by Information and Publicity Department of PCJSS from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Bangladesh. Phone & Fax : +880-351-61248, E-mail: pcjss@hotmail.com pcjss@gmail.com

Website: www.pcjss.org

Price : Tk. 30.00 Only